অনুরণন

bangladesh biology olympiad

DHAKA NORTH
2026
Vol. 3

/bdbo.org

bdbo.org

অনুরণন

প্রচ্ছদের আলোকচিত্র : রিফা সানজিদা

অঙ্গসজ্জা ও সম্পাদনা : জাহিন সুবহা

ভূমিকা

"বিজ্ঞান চর্চা মানে শুধু পরীক্ষা-নিরীক্ষা নয়, সত্য অনুসন্ধানের সাধনা"
— আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়

মানবসভ্যতার অগ্রযাত্রায় বিজ্ঞান এক অনিবার্য শক্তি যা কেবল জ্ঞানের পরিধি বাড়ায় না, বরং চিন্তাকে করে মুক্ত, যুক্তিকে করে প্রখর। এই চেতনা ধারণ করেই বাংলাদেশ জীববিজ্ঞান অলিম্পিয়াড দীর্ঘদিন ধরে কাজ করে যাচ্ছে তরুণ প্রজন্মের মধ্যে জীববিজ্ঞানের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি, বৈজ্ঞানিক মনন গঠন এবং সৃজনশীল চিন্তার বিকাশে।

প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত, অলিম্পিয়াড, বায়োক্যাম্প ও শিক্ষামূলক কার্যক্রমের মাধ্যমে বাংলাদেশ জীববিজ্ঞান অলিম্পিয়াড গড়ে তুলেছে এক প্রাণবন্ত মঞ্চ যেখানে কৌতূহলী মেধাগুলো নিজেদের বিকশিত করার সুযোগ পায়। তারই ধারাবাহিকতায় ২০১৬ সাল থেকে প্রতি বছর আন্তর্জাতিক প্রাঙ্গণে বাংলাদেশ থেকে প্রতিযোগীরা অংশ নিচ্ছে ও বিভিন্ন পুরস্কার অর্জন করে বাংলাদেশ এর নাম উজ্জ্বল করছে। এই পথচলায় সবচেয়ে বড় শক্তি
হিসেবে কাজ করেছে এর স্বেচ্ছাসেবকরা যাদের আমরা স্নেহভরে বলি "এনজাইম"। জীববিজ্ঞানের এনজাইম যেমন প্রতিক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করে, তেমনি এই এনজাইমরাও তাদের শ্রম, মেধা ও ভালোবাসা দিয়ে বাংলাদেশ জীববিজ্ঞান অলিম্পিয়াড এর প্রতিটি কার্যক্রমকে করেছে আরও গতিশীল ও সফল।

এই ধারাবাহিক প্রয়াসেরই এক সৃজনশীল বহিঃপ্রকাশ আমাদের বাংলাদেশ জীববিজ্ঞান অলিম্পিয়াড ঢাকা উত্তর অঞ্চলের ম্যাগাজিন অনুরণন। নামের মধ্যেই লুকিয়ে আছে এর আত্মা; এটি চিন্তার প্রতিধ্বনি, জ্ঞানের প্রতিফলন এবং অনুভূতির সৃজনধ্বনি। এই ম্যাগাজিনের প্রতিটি লেখা রচিত হয়েছে আমাদের সেই স্বেচ্ছাসেবক এনজাইমদের হাতেই যাদের ভাবনা, অভিজ্ঞতা ও সৃজনশীলতা এখানে একত্রে ধ্বনিত হয়েছে।

অনুরণন কেবল একটি প্রকাশনা নয়; এটি বাংলাদেশ জীববিজ্ঞান অলিম্পিয়াড এর দীর্ঘদিনের যাত্রার একটি দলিল, যেখানে বিজ্ঞান ও সাহিত্য মিলেমিশে সৃষ্টি করেছে এক অনন্য সুর। আমরা বিশ্বাস করি, এই ম্যাগাজিন পাঠকের মনে নতুন প্রশ্ন জাগাবে, নতুন চিন্তার জন্ম দেবে এবং জ্ঞানচর্চার প্রতি ভালোবাসা আরও গভীর করবে।

পরিশেষে, এই প্রয়াস সফল হোক এটাই আমাদের প্রত্যাশা। অনুরণন ছড়িয়ে পড়ুক মন থেকে মনে, জ্ঞান থেকে জ্ঞানে এবং হয়ে উঠুক আগামীর অনুপ্রেরণার উৎস।

ফাতেমা আক্তার রিতু
কোষাধ্যক্ষ
বাংলাদেশ জীববিজ্ঞান অলিম্পিয়াড (ঢাকা উত্তর)
ও
শিক্ষার্থী, শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

সভাপতির বাণী

সুজলা-সুফলা, শস্য-শ্যামলা আমাদের এই বাংলাদেশ বিশ্ব মানচিত্রে এক বিস্ময়কর মাতৃভূমি। এদেশের মাটি, পানি ও বায়ুর সান্নিধ্যে আমরা যেমন বেড়ে উঠেছি, তেমনি আমাদের মাঝে সঞ্চারিত হয়েছে জ্ঞানপিপাসা আর অন্যায়ের বিরুদ্ধে এক বিদ্রোহী চেতনা। মহান স্বাধীনতার পাঁচ দশক পেরিয়ে গেলেও আমরা শিক্ষাক্ষেত্রে আশানুরূপ লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারি। বিশেষ করে ব্যবহারিক ও কর্মমুখী শিক্ষার অভাব আমাদের সার্বিক অগ্রগতির পথে অন্যতম অন্তরায়। বর্তমান বিশ্ব এখন চতুর্থ শিল্প-বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করছে। এই বৈশ্বিক প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে হলে মানসম্মত ও যুগোপযোগী শিক্ষার কোনো বিকল্প নেই।

বাংলাদেশে বিজ্ঞান শিক্ষার প্রসার ঘটলেও প্রকৃত 'বিজ্ঞান চর্চার সংস্কৃতি এখনো সেভাবে গড়ে ওঠেনি। অথচ বিজ্ঞানমনস্কতা ছাড়া আধুনিক বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে চলা অসম্ভব। এই উপলব্ধি থেকেই বাংলাদেশ জীববিজ্ঞান অলিম্পিয়াড (বিডিবিও) ২০১৬ সাল থেকে বিজ্ঞানের আলো ছড়িয়ে দিতে কাজ করে যাচ্ছে। দেশজুড়ে আঞ্চলিক উৎসবের মাধ্যমে আমরা সেরা মেধাবীদের বাছাই করি, যারা পরবর্তী ধাপে জাতীয় উৎসবে অংশ নেয়। এরপর নিবিড় প্রশিক্ষণের জন্য আয়োজিত হয় 'ন্যাশনাল বায়োক্যাম্প', যেখান থেকে নির্বাচিত চারজন প্রতিনিধি আন্তর্জাতিক জীববিজ্ঞান অলিম্পিয়াডে (IBO) বাংলাদেশের লাল-সবুজ পতাকা বহন করে। ২০১৮ সাল থেকে আমাদের তরুণরা এই বিশ্বমঞ্চে নিয়মিত অসামান্য সাফল্য অর্জন করে দেশের মর্যাদা উজ্জ্বল করছে।

এই বিশাল কর্মযজ্ঞ সফল করা মোটেও সহজ নয়। এই সাফল্যের নেপথ্যের কারিগর আমাদের একনিষ্ঠ স্বেচ্ছাসেবীরা, যাদের আমরা ভালোবেসে 'এনজাইম' বলে ডাকি। তাদের অক্লান্ত পরিশ্রম ও ত্যাগের মাধ্যমেই বিডিবিও আজ এই অবস্থানে পৌঁছেছে।

বিডিবিও-এর ১২টি অঞ্চলের মধ্যে অন্যতম প্রাণবন্ত ও বৃহৎ অঞ্চল হলো **ঢাকা উত্তর**। প্রায় আড়াইশ '**এনজাইম**' প্রতিবছর অসীম উদ্দীপনা নিয়ে এখানে কাজ করে। এই অঞ্চলের প্রথম প্রকাশনা '**পত্রক**' সবার প্রশংসা কুড়িয়েছিল। সেই ধারাবাহিকতায় এবার প্রকাশিত হতে যাচ্ছে তৃতীয় ম্যাগাজিন '**অনুরণন**'। সায়েন্স ফিকশন, ছোটগল্প, ফিচার ও ফটো-গ্যালারিতে সমৃদ্ধ এই ম্যাগাজিনটি সফলভাবে আলোর মুখ দেখুক এটাই আমার প্রত্যাশা।

যারা নিজেদের মেধা, শ্রম ও সময় দিয়ে 'অনুরণন' কে সমৃদ্ধ করেছেন, তাদের জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। আমি বিশ্বাস করি, এই প্রকাশনাটি শিক্ষার্থীদের বিজ্ঞানমনস্কতা বৃদ্ধি এবং চিন্তার খোরাক যোগাতে কার্যকর ভূমিকা রাখবে।

ধন্যবাদান্তে

ড. জামিলুর রহমান
সভাপতি, বাংলাদেশ জীববিজ্ঞান অলিম্পিয়াড (ঢাকা উত্তর)
ও
অধ্যাপক, শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়।

সাধারণ সম্পাদকের বাণী

জ্ঞান, অনুসন্ধান ও কৌতূহল—এই তিনের সম্মিলনেই গড়ে ওঠে বিজ্ঞানচর্চার ভিত্তি।পরিবর্তনশীল এই পৃথিবীতে নিজেকে এগিয়ে রাখতে হলে কেবল পাঠ্যবইয়ের সীমায় আবদ্ধ থাকলেই চলে না; প্রয়োজন সৃজনশীল চিন্তা, প্রশ্ন করার সাহস এবং অজানাকে জানার অদম্য ইচ্ছা।

বাংলাদেশ জীববিজ্ঞান অলিম্পিয়াড দীর্ঘদিন ধরে দেশের তরুণ শিক্ষার্থীদের মধ্যে সেই অনুসন্ধিৎসু মন গড়ে তোলার প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে। এই যাত্রায় ঢাকা উত্তর অঞ্চল একটি প্রাণবন্ত ও সক্রিয় প্ল্যাটফর্ম হিসেবে প্রতি বছরই নতুন উদ্দীপনায় কাজ করে চলেছে। আমাদের 'এনজাইম'রা তাদের সময়, শ্রম ও মেধা দিয়ে যে নিষ্ঠার সঙ্গে এই কার্যক্রমকে এগিয়ে নিচ্ছে, তা নিঃসন্দেহে অনুপ্রেরণাদায়ক।

এই ধারাবাহিকতায় এবছর প্রকাশিত হচ্ছে আমাদের বার্ষিক ম্যাগাজিন "অনুরণন"। নামের মধ্যেই এর দর্শন নিহিত, একটি ভাবনা, একটি প্রশ্ন কিংবা একটি ছোট্ট অনুপ্রেরণা কীভাবে এক মন থেকে আরেক মনে প্রতিধ্বনিত হয়ে বিস্তৃতহয়, সেই অনুরণনেরই বহিঃপ্রকাশ এই ম্যাগাজিন। এখানে স্থান পেয়েছে আমাদের এনজাইমদের সৃজনশীল চিন্তা, বিজ্ঞানমনস্ক লেখা, অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধির নানান রূপ।

আমরা বিশ্বাস করি, "অনুরণন" শুধুমাত্র একটি প্রকাশনা নয়; বরং এটি একটি প্ল্যাটফর্ম, যেখানে জ্ঞান, কল্পনা ও সৃজনশীলতা একত্রিত হয়ে নতুন ভাবনার জন্ম দেয়। এই ম্যাগাজিন পাঠকের মধ্যে বিজ্ঞানচর্চার আগ্রহ জাগিয়ে তুলবেএবং ভবিষ্যৎ পথচলায় ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে—এটাই আমাদের প্রত্যাশা।

যারা এই ম্যাগাজিনের প্রতিটি ধাপে শ্রম, মেধা ও সময় দিয়েছেন—সকলকে জানাই আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও শুভেচ্ছা। সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টায় "অনুরণন" পাঠকের হৃদয়ে স্থান করে নেবে এবং আমাদের আগামী পথচলার প্রেরণা হয়ে থাকবে এই বিশ্বাস ব্যক্ত করছি।

ধন্যবাদান্তে

মোঃ রানা ইসলাম
সাধারণ সম্পাদক
বাংলাদেশ জীববিজ্ঞান অলিম্পিয়াড (ঢাকা উত্তর)
ও
শিক্ষার্থী, শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

সম্পাদকীয়

বাংলাদেশ জীববিজ্ঞান অলিম্পিয়াড একটি প্রাণবন্ত সংগঠন । প্রাণবন্ত শব্দটি ব্যবহারের কারণ এই সংগঠন সারাদেশব্যাপী নবপ্রজন্মের মধ্যে জীববিজ্ঞান বা প্রাণের বিজ্ঞান নিয়ে নতুন আঙ্গিকে চিন্তা করার জন্য একনিষ্ঠ কর্মযজ্ঞ চালিয়ে যাচ্ছে । দেশব্যাপী সপ্তম থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করার পাশাপাশি এই সংগঠন স্বেচ্ছাসেবক দের মেধা ও মননের বিকাশের জন্য অনবদ্য ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে । বার্ষিক ম্যাগাজিন প্রকাশনা এমনই একটি অনন্য উদ্যোগ যার দ্বারা এনজাইমরা তাদের বিজ্ঞান বিষয়ক জ্ঞান ও মননকে প্রস্ফুটিত করতে সক্ষম।

ভার্চুয়ালিটির এই যুগেও কিছু মানুষ মোবাইল ফোনের নোটপ্যাড এর পরিবর্তে হাতে কলমে দৈনন্দিন রুটিন তৈরিতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন , চ্যাটজিপিটির পরিবর্তে নিজের মেধার চূড়ান্ত ব্যবহার করতে ভালোবাসেন, সোশ্যাল মিডিয়া স্ক্রলিং এর পরিবর্তে বই, ম্যাগাজিন, পত্রিকা পড়ে নিজের অবসর সময় অতিবাহিত করতে পছন্দ করেন। বাংলাদেশ জীববিজ্ঞান অলিম্পিয়াড ঢাকা উত্তরাঞ্চল কর্তৃক প্রকাশিত ম্যাগাজিন অনুরণন এই ধারায় এক অনন্য মাত্রা যোগ করে।

এই মহৎ প্রয়াসের ছোট্ট একটি অংশ হতে পেরে আমি আনন্দিত ও কৃতজ্ঞ। আপনাদের কাছে একটি নির্ভুল ও আকর্ষণীয় ম্যাগাজিন প্রকাশ করাই ছিল আমাদের চেষ্টা। তবুও কোন ভুল ত্রুটি থাকলে মার্জনা করে বাধিত করবেন।

যাদের সৃষ্টিতে অনুরণন সমৃদ্ধ, তাদেরকে জানাই শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। অদূর ভবিষ্যতে অনুরণন এর সমৃদ্ধি বজায় থাকবে এটাই আমাদের প্রত্যাশা।

জাহিন সুবহা
যুগ্ম সম্পাদক
বাংলাদেশ জীববিজ্ঞান অলিম্পিয়াড (ঢাকা উত্তর)
ও
শিক্ষার্থী, শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

উৎসর্গ

মুহাম্মাদ আল-দারবি'র মতো শিশুদেরকে, ফিলিস্তিনে যারা
খাবারের অভাবে বালু খেয়ে বাঁচার চেষ্টা করছিলো।

bangladesh biology olympiad

সূচীপত্র

লেখনী	পাতা
মুসুন	১
যেখানে ফিরে তাকাইনি	৫
জীবনের সংযোগ: এনজাইম থেকে যোগাযোগ	৬
নানান জানা-অজানা	৭
স্মৃতির বাতায়ন	১০
দ্য ডেল্টা ল্যাটিস	১১
জীববিজ্ঞান অলিম্পিয়াডের প্রচারণায় এক স্মরণীয় দিন	১৩
মিউটেশন: পরিবর্তনের অদৃশ্য কবিতা	১৪
মাইক্রো-অ্যাভেঞ্জার্স': পোকামাকড়ের অবিশ্বাস্য সুপারপাওয়ার	১৫
শেষ অ্যান্টিবায়োটিক	১৭
চোখের বিদ্রোহ	১৯
জীবন জীবনই	২০
DNA এর আদ্যোপান্ত	২১
স্বপ্নের গন্তব্যে - প্যারাসাইটোলজি	২২
শব্দেন্দ্রিয় ও কুরআন	২৩
নদী পুনর্জীবনের কল্পনা	২৪
বিজ্ঞানের আলো	২৬
মাটির গন্ধে লুকানো বিজ্ঞান: এক বৃষ্টিভেজা উপলব্ধি	২৭
পাতার ভেতরের গোপন জগৎ: এক ছোট্ট অভিজ্ঞতা, বড় উপলব্ধি	২৮
CRISPR: জিনের ভাষা পুনর্লিখনের সাহসী বিজ্ঞান	২৯
ডোপামিন ব্যবসা	৩১
স্মৃতির বীজ	৩৫

সূচীপত্র

কবিতা	পাতা
বিজ্ঞানের আলো	৩৮
জীবনের গোপন সুর	৩৯
ফিরে দেখো	
আঞ্চলিক জীববিজ্ঞান উৎসব (ঢাকা উত্তর)	৪০
জাতীয় জীববিজ্ঞান উৎসব, বায়োক্যাম্প	৪২
বিজ্ঞান উৎসবে অ্যাকাডেমিক টিম	৪৩
প্রচারণা ও বার্ষিক সাধারণ সভা	৪৪
আলোকচিত্র	৪৫
বিগত বছরের সাফল্য	৫২

মুসুন

১

"প্রকৃতির সাথে এক অদ্ভুত লড়াই করছি আমরা!", কিছুটা বিরক্তের সুরে বললো ড. নুসরাত।

প্যাসিফিকের বুক চিঁড়ে বেড়ে ওঠা তিনটি দ্বীপ কয়েক হাজার বছর ধরে মানব চক্ষুর আড়ালে ছিলো। পথ হারানো এক দল নাবিকের চোখে বছর পাঁচেক আগে দ্বীপগুলো চোখে পরে। বড় দ্বীপটির আকার প্রায় ৯ বর্গকিলোমিটার, আর ছোট দুটি দ্বীপ প্রায় ৪ বর্গকিলোমিটার। বড় দ্বীপটির নাম দেয়া হয়েছে ম্যারি আইল্যান্ড, আর ছোট দুটির নাম ইরিন আইল্যান্ড ও ইভ আইল্যান্ড। দ্বীপগুলোর গাছপালা, বিস্তৃত সাগর পাড়, সবকিছুই স্বাভাবিক। ওশেনিয়ান দ্বীপপুঞ্জ থেকে কাছাকাছি হওয়ায় ভৌগোলিক অবস্থা ও জীববৈচিত্র্য অনেকটা একইরকম। দ্বীপগুলোয় কিছু পাহাড় আছে। ধারনা করা হচ্ছে এগুলো হয়তো হাজার বছর ধরে ঘুমিয়ে থাকা আগ্নেয়গিরি। কারন এখানকার মাটিতে আগ্নেয় শিলার অস্তিত্ব আছে।

জনমানবহীন এই দ্বীপগুলোয় এক বছর আগে প্রথম একদল গবেষক আসে। প্রায় দুই মাস তারা এই দ্বীপগুলো চষে বেড়ায়। দুই মাসে তারা প্রায় উনিশ প্রজাতির নতুন গাছপালা ও বত্রিশ প্রজাতির নতুন জীব আবিষ্কার করে। গবেষক দলের একজন তরুণ ডাচ বিজ্ঞানী, ড. ফ্রিম্যান অদ্ভুত এক বিষয় আবিষ্কার করেন। পুরো দ্বীপে তিনি কোনো মাকড়সা খুঁজে পাননি! বিষয়টা মনে হতে পারে খুবই সাধারণ, কিন্তু তার কাছে বিষয়টি খটকা লাগে।

ম্যারি দ্বীপের এক কোণায় সাগর পাড়ে গড়ে তোলা হয়েছে অস্থায়ী ক্যাম্প। সেখানে কাজ করছে ৮ জন গবেষক সহ মোট ১৫ সদস্যের একটি ক্রু। গবেষক দলের মধ্যে সবথেকে জুনিয়র হলেন ড. নুসরাত। রিসার্চ এসিস্ট্যান্ট হিসেবে ফ্র্যাংকফুটের গথে ইউনিভার্সিটিতে মলিকিউলার প্যাথলজি বিভাগে মাত্র ৬ মাস যাবৎ কাজ করছে। এরই মধ্যে তার মেধার পরিচয় সে প্রতিনিয়ত দিচ্ছে। পাশাপাশি তার কথায় কথায় বিরক্ত হয়ে যাওয়ার প্রবণতাও মনে হচ্ছে দিন দিন বাড়ছে।

"প্রকৃতির এক বিশ্রী খামখেয়ালির সাথে যুদ্ধ করছি আমরা!", নুসরাত এবার আরো উচ্চস্বরে, রাগান্বিত কণ্ঠে বলে উঠলো।

ল্যাবের বাকিরা তাকিয়ে আছে তার দিকে।

"মাকড়সা নেই, এটা কি আমাদের দোষ? আজব ব্যাপার। নিয়ে এসে ছেড়ে দিলাম হাজার খানেক, সেগুলোও দেখছি গায়েব। নিশ্চয়ই কোনো পোকামাকড় বা পাখি আছে যারা এগুলোকে খুব মজা করে খায়!", বিরক্তের সুরে সে বললো।

ড. রন পাশেই বসা ছিলেন। নুসরাতের কথা শুনে বললো, "গত পাঁচ দিন ধরে একটা মাকড়সা দেখছি না, ব্যাপারটা কিন্তু আসলেই অদ্ভুত। শুধু মাকড়সাই কেন! অন্য পোকামাকড় কেন না?"

মাইক্রোস্কোপে কি যেন দেখতে দেখতে ড. ম্যাক্স বললো, "আমাদের আসলে পুরো দ্বীপটা ভালো করে দেখা উচিত। আমাদের চোখগুলো শুধু মাকড়সাই খুঁজছে, যেটা উচিত হচ্ছে না। আমাদের চোখ কান খোলা রেখে পুরো দ্বীপেই ভালো করে ঘুরে দেখা উচিত।"

"ঠিক, এই কাজটা না করলে আমরা কোনো ক্লু পাচ্ছি না। মরে গেলেও মাকড়ার ট্রেস তো থাকারই কথা। সেগুলো কই যাচ্ছে বোঝা উচিত আমাদের।," ড. প্যাট্রিক মোটা চশমাটা নাকের ডগায় নামিয়ে বললো।

"কালই চলুন তাহলে? আমি এই জনমানবহীন জায়গায় বেশি সময় নষ্ট করতে রাজি না।", নুসরাত বললো। বলেই সে চেয়ার ছেড়ে কফি বানাতে উঠে চলে গেলো। গলায় পরপর দুই কাপ ডার্ক কফি না ঢাললে ওর মেজাজ আজ আর ভালো হবে না।

২

পুরো দ্বীপ জুড়ে দীর্ঘ ছয় ঘন্টা অভিযানের পর এই দলের প্রাপ্তি এখনো শূণ্য। নাহ্, পুরোপুরি শূণ্য বলা চলে না, একটা নতুন ছত্রাক খুঁজে পেয়েছি পেরেছে দলটি। এখনো ছত্রাকটি নিয়ে কিছু জানে না তারা, আদৌ এটি নতুন নাকি পুরনো তা দেখতে হবে ল্যাবে চেক করে।

"আমাদের একটু বিশ্রাম করা দরকার। পাহাড়ে ঘুরে ঘুরে শরীরের বারোটা বেজে গেলো।", ড. জেসি বললেন।

সবাই সায় জানিয়ে পাহাড়ের নিচে নামতে লাগলো। নিচে আসতে আসতে পাহাড়ের নিচে পাথরের গায়ে একটা ছোট্ট ফাটল দেখলো ড. ম্যাক্স, "এই, সবাই এদিক এসো। এখানে একটা ছোট্ট গুহা মনে হচ্ছে, চলো এটায় ঢুকে দেখা যাক।"

সবাই হুড়মুড়িয়ে গুহায় ঢুকে পড়লো। দিনের প্রখর রোদ শেষে পাথরের শীতল গহ্বরে ঢুকে সবাই যেন হাফ ছেড়ে বাঁচলো। কিন্তু গুহার প্রাচীরের দেয়ালের

সবার চোখ চলে গেলো একটা পাশে, সেখানে আট পা ওয়ালা একটা কীটের ছবি আঁকা, মাকড়সা!
"আরেহ, এই দ্বীপে আগে সম্ভবত মাকড়সা ছিলো! দেখো দেখো.....", প্যাট্রিক উত্তেজিত কণ্ঠে বললো।
সবাই সম্মতির সাথে তাকিয়ে দেখলো ছবিটা। কিন্তু এর ওপরেই একটা ছোট্ট ছবির দিকে সবার চোখ আটকে গেল। কোনাকুনি তিনটি বৃত্ত, দুই পাশের দুই বৃত্তের উপরে শিং এর মত বাঁকানো কিছু একটা আঁকা । ছবিটা দেখে মনে হচ্ছে মহিষের মাথার মতো কিছু একটা। কিন্তু জিনিসটা আসলে কি তা কেউই ঠিক বুঝতে পারলো না। ম্যাক্স বলে উঠলো, "মহিষের সাথে মাকড়সার কি সম্পর্ক!"

[গুহার দেয়ালে খোদাই করা ছবি]

অনেক্ষণ সূক্ষ্মদৃষ্টিতে সবাই দেখলো। অবশেষে নুসরাত বললো, "আমরা সম্ভবত আমাদের রহস্যের সমাধান পেয়েছি। এই ছবিটায়-ই সম্ভবত আমাদের রহস্যের জট খোলা আছে।"
মুর বললো, "সম্ভবত হ্যা, যদি ছবিটা আমরা বুঝতে পারি তাহলেই হয়তো উত্তর পাওয়া যেতো!"

৩

দুই দিন পার হয়ে গেলো। এখনো তেমন কোনো অগ্রগতি পাওয়া গেলো না।
নুসরাত প্যাথলজি ল্যাবে বাকিদের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা ছিলো এই টানা দুই দিন। অর্থাৎ প্রায় ৫২ ঘন্টা তিনি নিজের ল্যাবেই কাটিয়েছে। ওদিকে বাকিরা সবাই সন্ধ্যায় চায়ের আড্ডায় বসেছে।
আড্ডার মোড় ঘুরিয়ে দিলো রন, "আমাদের কাজ এগোচ্ছে না এখান থেকে। আগামীকাল সকালে জাহাজ আসবে খাবার ও মালপত্র নিয়ে। ওটায় চলে যেতে পারলে আমার সবথেকে ভালো লাগতো।"
জেসি বিস্কুকে কামড় দিয়ে ভরা মুখেই শুরু করলো, "ওই মাকড়সার ছবিটা থেকে কিছুই বোঝা যাচ্ছে না । প্যাথেটিক! "
মুর বললো, "এটা এমন কিছু বোঝাচ্ছে যা হয়তো সেই কয়েক হাজার বছর আগে মাকড়সার মারা যাওয়ার কারন।"
"এমন কি থাকতে পারে যা এই মাকড়সার মৃত্যুর কারণ হতে পারে! জিনিসটা দেখতে তো ষাঁড়ের মাথার মতো দেখাচ্ছে।", মুর বললো।
ম্যাক্স দাড়ি চুলকাতে চুলকাতে বললো, "আমরা টোঙা দ্বীপের কাছাকাছি আছি। এখানের টোঙা দ্বীপের ভাষায় ষাঁড়কে মুসুন (Musune) বলে। আমরা এই চিহ্নটাকে মুসুন বলতে পারি।"
"এক্সিলেন্ট!", প্যাট্রিক বলে উঠলো।
"এক্সিলেন্টের কিছুই হয় নি, এই জিনিসটা কি, কেন মাকড়সাগুলোকে মারলো, কিভাবে মারলো, কিছুই আমরা জানি না।", বললো জেসি।
কথা বলতে বলতে ধুম করে দরজা খুলে গেলো। দরজায় উদভ্রান্তের মতো চেহারায় দাড়িয়ে আছে নুসরাত। চুল উসকোখুসকো, চেহারায় মলিন ভাব, চোখ দেবে আছে। "চেয়ারম্যান ড. জর্ডান কোথায় আছেন? উনাকে কেউ একটু এখুনি ডাকুন। আমার মনে হচ্ছে মাকড়সার রহস্য সমাধান হয়ে গেছে। আর আমার এটাও মনে হচ্ছে যে, যত দ্রুত সম্ভব আমাদের এই অভিশপ্ত জায়গা ছেড়ে পালানো উচিত!"

৪

সবাই হা করে তাকিয়ে আছে, কেউ কিছু বলার ভাষা ও সাহস কোনেটিই পাচ্ছে না। নুসরাত এগিয়ে এসে দুটো ছবি রাখলো টেবিলের ওপর। প্রথম ছবিটা একটা মাইক্রোস্কোপিক ছবি। দেখে মনে হচ্ছে ছত্রাক কোষের ছবি। তিনটি প্যাঁচ দেয়া একটা টিউব আকৃতির কোষ।

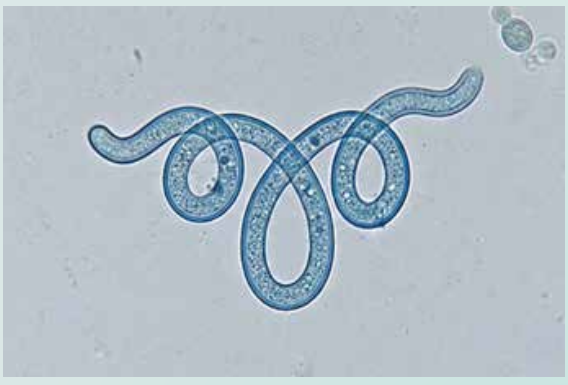

[ড. নুসরাতের মাইক্রোস্কোপে মুসুন-এর একটি কোষের ছবি]

রন নীরবতা ভাঙলো, "এটা কি?"
নুসরাত উত্তর দিলো, "সেই যে গতকালের ছত্রাক। আমরা যা স্যাম্পল নিয়েছিলাম তা হলো একটি কলোনি। আদতে এরা এককোষী।"
"তাহলে খোদাই করা পাথরে কি এদেরই ছবি আঁকা?" ম্যাক্স বললো।

“হ্যা, নিচের এই ছবির সাথে মিলিয়ে দেখতে পারেন।”
আসলেই তাই! নিচের ছবিটায় পাথরের খোদাইয়ের ছবি আছে। পাশাপাশি রাখলে দুটিকে একরকমই লাগে।
প্যাট্রিক বললো, “এতে ভয়ের কি আছে? আমাদের এখান থেকে পালাতে হবে কেন?”
“কারণ আপনি, আমি, আমরা সবাই হয়তো ইতোমধ্যে মৃত্যুর টিকিট কেটে নিয়েছি নিজের অজান্তেই।”
চেয়ারম্যান ড. জর্ডান ইতোমধ্যে চলে এসেছেন। এসেই বললেন, “কি হয়েছে নুসরাত? বিস্তারিত বলুন তো শুনি। আগে ঠান্ডা হয়ে বসুন, পানি খান ।”
একটু বসে থিতু হয়ে নুসরাত বলা শুরু করলো। “মাকড়সার হাঁটুতে কোষগুলোতে এক বিশেষ রিসেপ্টর থাকে, নাম Octapine receptors, যেগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বেশি থাকে G-Protein Coupled Receptors (GPCRs). এগুলো মূলত চার প্রকারের হয়। α1, α2, β andregenic এবং Octamine/Tyramine receptor. কিছু বিজ্ঞানী আরেকটি রিসেপ্টরের সম্ভাবনার কথা উল্লেখ করেছেন বেশ কয়েকবার। তারা এটাকে Z Receptor বলে উল্লেখ করেছিলেন যা শুধুমাত্র মাকড়সার দেহেই থাকে।”
একটু বিরতি দিয়ে নুসরাত বলা শুরু করলো, “এই রিসেপ্টরগুলো নিউরোট্রান্সমিট রেগুলেট করে। সহজ কথায় এগুলো মাকড়সার চলাফেরা-কার্যকালাপ সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করে। এবার কথা হলো, এই রিসেপ্টরগুলোকে যদি কেউ নিয়ন্ত্রণে নিতে পারে, তাহলেই কিন্তু প্রাণীটাকে সে নিয়ন্ত্রণে নিয়ে নিতে পারে।”
সবাই মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে শুনছে। ড. জর্ডান বললো, “আপনাদের সদ্য নাম দেয়া মুসুন কি এই কাজ করতে পারে? অনেকটা জোম্বি ফাঙ্গাসের মতো?”
“জ্বী স্যার, আপনি ঠিক ধরেছেন। কিন্তু গল্প আরো বাকি আছে। এরা Aflatrem, Sphingosine, Myriocin নামক কিছু Anto-Octamine Receptor তৈরী করতে পারে। এতে ছত্রাকটি যখন আক্রমণ করে, তখন Z রিসেপ্টর বন্ধ করে মাকড়সার চলাফেরাও নিয়ন্ত্রণ করে, সাথে একে Anti receptor দিয়ে ধীরে ধীরে মেরেও ফেলে।”
ম্যাক্স বলে উঠলো, “কিন্তু আমরা কোনো মরা মাকড়সাও পেলাম না কেন?”
“কারণ, এরা শুধু মেরেই থেমে থাকে না। দ্রুত শরীরটাকে পচিয়ে ফেলে। কাইটিনেজ সহ আরো কিছু ডিহাইড্রোজিনেজ এনজাইম তৈরী করে, ফলে এগুলো একবারে তরল স্যুগারে পরিণত হয়ে যায়।”
“সাংঘাতিক! কিন্তু এরা যদি নির্দিষ্ট রিসেপ্টরে আক্রমণ করে থাকে, তাহলে কিভাবে মাকড়সা ছাড়া বছরের পর বছর বেঁচে রইলো?” মুর জানতে চাইলো।
“এখানেই আমার সতর্কতার কারণ। ঠিক এই কারণের আমাদের যত দ্রুত সম্ভব এই দ্বীপগুলো থেকে দূরে চলে যেতে হবে। মুসুনদের সম্ভবত দুটি হোস্ট ও একটি মিউচুয়াল হোস্ট আছে। মিউচুয়াল হোস্টটি হলো একধরনের লতানো গাছ, যা আমাদের আগের অভিযাত্রিক দল আবিষ্কার করে গেছেন। ছত্রাকগুলো ওই গাছে বাঁচতে পারে, গাছের ক্ষতি না করেই। বিনিময়ে ওরা গাছটিকে কিছু এনজাইম তৈরী করে দেয়, যা গাছটিকে পোকামাকড় থেকে বাঁচিয়ে রাখে। এই মুসুনের একটি হোস্ট মাকড়সা। আর সম্ভবত আরেকটি হোস্ট আমরা!”
কথাটি শুনে সবার শিরদাঁড়া বেয়ে একটা শীতল স্রোত বেয়ে গেলো।
“কেন আপনার এরকম মনে হলো?”, চেয়ারম্যান বললেন।
“প্রায় চার বছর আগে ড. ফ্রেডরিখ রিচম্যান আমাদের ব্রেনে এক ধরনের রিসেপ্টর সম্পর্কে ধারনা দিয়েছিলেন, যারা স্বল্প মাত্রার বৈদ্যুতিক সিগন্যাল গ্রহণ ও বিচ্ছুরণ করতে পারে। এর সম্পর্কে যা তথ্য পাওয়া যায় তা প্রায় পুরোপুরিভাবে Z receptor এর সাথে মিলে যায়।
অর্থাৎ এই মুসুন আমাদের আক্রমণ করলে আমরাও মুসুনের অধীনে চলে যাবো। ওদের কথামতো আমাদের চলতে হবে যতদিন না আমাদের মস্তিষ্ক পুরোপুরি গলিয়ে না ফেলে।
প্রাচীণ জাতিরা এই ছত্রাক কিভাবে দেখতে পেরেছিলো জানি না, তবে তারা একে দেখেছিলো এব্যাপারে আমি শতভাগ নিশ্চিত। আর এজন্যইএই মুসুনকে প্রাচীণ জাতিরা এভাবে এঁকে রেখেছিলো, বুঝাতে চেয়েছিলো যে এরা মাকড়সার মাধ্যমে মানুষের মাঝে ছড়ায়।”
সবাই খুব মন দিয়ে কথাগুলো শুনছিলো। ড. জর্ডান বললেন, “ভয়ানক ব্যাপার। এরা যদি ছত্রাক হয়ে থাকে, তাহলে এদের স্পোর ছড়ানো খুবই স্বাভাবিক । আমাদের আগেও তো এক দল গবেষক এখানে এসেছেন। যদি তারা ইতোমধ্যে আক্রান্ত হয়ে থাকেন, তবে জানি না তাদের এখন কি দশা!”

নুসরাত বললো, “ঠিক একই ব্যাপার আমাদের দলের জন্যও প্রযোজ্য। আমরাও যদি ইতোমধ্যে আক্রান্ত হয়ে থাকি, তাহলে আমরা জানি না সামনে আমাদের জন্য কি অপেক্ষা করছে।”

[নোটঃ ছবিগুলো AI দ্বারা তৈরী।]

হাসিবুল ইসলাম
শিক্ষার্থী, কৌলিতত্ত্ব ও উদ্ভিদ প্রজনন বিভাগ
শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়

যেখানে ফিরে তাকাইনি

এক পড়ন্ত দুপুর বেলা। রাজশাহী রেলওয়ে স্টেশনের চিরচেনা সেই কোলাহলে আজ নিজেকে বড় বেশি অচেনা মনে হচ্ছে । হাতে একটি নিউজপেপার, কিন্তু চোখ দুটো অনেকক্ষণ ধরে একটা হেডলাইনেই আটকে আছে।

হঠাৎ ভিড়ের মাঝে একটা অবয়ব দেখে আমার বুকের ভেতরটা ধক করে উঠল। সেই চেনা হাঁটার ভঙ্গি, চুলের সেই অবাধ্য ভাঁজ যা বাতাসের ঝাপটায় কপালে এসে পড়ছে। আমি স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। ট্রেনের হুইসেলের শব্দ ছাপিয়ে আমার হৃদপিণ্ডের শব্দ নিজের কানেই বাজছে। একটা তীব্র মোচড় ঠিক যেন কয়েক বছর আগের সেই ক্ষতটা কেউ নতুন করে খুঁড়ে দিল।

সেই অভিমানিনী। তার পরনে আভিজাত্যের ছাপ, চোখে এখন আর সেই তরুণীসুলভ চপলতা নেই, আছে গভীর স্থিরতা।

সে এদিক-ওদিক তাকাচ্ছিল, হয়তো কাউকে খুঁজছে। হঠাৎ তার চোখে পড়ল আমাকে । মুহূর্তের জন্য সে থমকে দাঁড়াল। ভিড় ঠেলে এগিয়ে আসতে শুরু করল।

খুব নিচু স্বরে ডাকল আমার নামটি ধরে। কণ্ঠটা এখনও আগের মতোই মায়াবী, যা একসময় সময়কে থামিয়ে দিত। পরিষ্কার শুনতে পেলাম সেই ডাক। শরীরের প্রতিটি কোষ চাইছে ঘুরে তাকাতে, সেই চোখের দিকে চেয়ে জিজ্ঞেস করতে "কেন গিয়েছিলে?"

কিন্তু ফিরলাম না। আমি অনুভব করল সে ঠিক আমার পেছনেই দাঁড়িয়ে আছে। বাতাসের সাথে ভেসে আসছে তার ব্যবহৃত সেই চেনা পারফিউমের ঘ্রাণ।

‘তুমি কি আমাকে চিনতে পারছো?” কণ্ঠে এবার খানিকটা আকুতি।কিন্তু আমি শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।আমি জানি , আজ যদি ফিরে তাকাই, তবে তার বছরের পর বছর এই তিলে তিলে গড়ে তোলা “শক্ত মানুষটা”; মুহূর্তেই ভেঙে চুরমার হয়ে যাবে। আমি আজ আর সেই ‘নিরাপদ জায়গা’ হতে চাই না, যা অনায়াসেই ছেড়ে যাওয়া যায়।
প্লাটফর্মে তখন ট্রেন ছাড়ার ঘোষণা হচ্ছে। নিজের ব্যাগটা কাঁধে টেনে নিলাম। আবারও ডাকল, ‘একটা বার তাকাও!”
কিন্তু আমি এক পা, দু পা করে সামনের দিকে হাঁটতে শুরু করলাম । ভিড়ের মাঝে মিশে যাওয়ার আগে আমি শুধু মনে মনে বললাম , “তুমিই তো বলেছিলে নিজেকে শক্ত করতে ”..। আজ আমি এতটাই শক্ত যে, তোমার ডাক আমাকে আর ফেরাতে পারে না।

মো: আল শাহরিয়ার
কৃষি অনুষদ
ব্যাচ: ২১
শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়

জীবনের সংযোগ: এনজাইম থেকে যোগাযোগ

হ্যালো এনজাইম বন্ধুরা,

বায়োলজি অলিম্পিয়াড আজ বৃহৎ উদ্যোগে সারাদেশে উৎসবমূখর পরিবেশে পালিত হচ্ছে। উৎসবের রং আজ শুধু অলিম্পিয়াডে অংশগ্রহণ করা শিক্ষার্থীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেনি। এই উৎসব আজ অলিম্পিয়াড সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা এক ঝাঁক এনজাইমদের মাঝেও ছড়িয়ে গেছে।

তোমরা জানো, প্রকৃতিতে প্রতিটি প্রাণী কোনো না কোনোভাবে যোগাযোগ করে। উদ্ভিদের পাতায় রাসায়নিক সংকেত, মৌমাছির সেই নাচের ভাষা বা বি ড্যান্সও আমাদের যোগাযোগকে মনে করিয়ে দেয়। এটা আসলে আমাদের Biological Instinct বলতে পারো। বাংলাদেশ বায়োলজি অলিম্পিয়াড আসলে তোমাকে আমাকে সেটারই সুযোগ করে দিচ্ছে। এখানে তুমি সব ধরনের চমৎকার চমৎকার সব মানুষদের সান্নিধ্যে আসতে পারার সুযোগ পাবে। জীববিজ্ঞানে দক্ষ ও জাতীয় পর্যায়ে নেতৃত্ব দেওয়াও অসংখ্য মানুষকে তুমি পাবে এই জীববিজ্ঞান উৎসবে। তুমি এখানে নেতৃত্ব দিয়ে তোমার সুপ্ত, সুন্দর প্রতিভাকে বিকাশ করার সুযোগ পাচ্ছ। অসাধারণ সব মানুষের সাথে তোমার সারাজীবনের একটা বন্ডিং তৈরি হচ্ছে। জীববিজ্ঞানে এই কমিউনিকেশনের একটা নাম আছে বন্ধুরা, তা হচ্ছে Communication of Science বা এটাকে আমরা Mutual Benefit বলতে পারি। এই এনজাইম যারা কিনা নিজেরা বিক্রিয়া ঘটাতে সাহায্য করে কিন্তু বিক্রিয়া শেষে অপরিবর্তিত থাকে, ঠিক তেমনি বায়োলজি অলিম্পিয়াডের এই জগতে নিজেকে মহৎ গুণ দ্বারা দেশ ও জাতিকে সমৃদ্ধ করো এবং নিজেক আরো বিকশিত করো সবার জন্য।

মোঃ শাহিন আলম
কৃষি ব্যবসা ব্যবস্থাপনা অনুষদ
ব্যাচ: ২২
শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়

নানান জানা অজানা

মাটির বদলে অন্য কিছুর ওপর কী গাছ জন্মায়?

এম.এন. ভিদে নামে একজন পুষ্পপ্রেমী দেখিয়েছেন যে টবে মাটির বদলে ফেলে দেওয়া কাগজ টুকরো করে কেটে তাতে আলু বা অন্য আনাজের খোসার সার ও অল্প পানি দিলে গাছ জন্মায়। বহুতল বাড়িতে যাঁরা থাকেন, বড় শহরে যেখানে মাটির অভাব, সেখানে এই মাটির বিকল্প খুবই কাজের। এতে করে গাছ তো জন্মায়ই, বরং ময়লা কাগজ ও আনাজের খোসাজনিত দূষণের হাত থেকেও বাঁচা যায়। তাছাড়া হাইড্রোপনিক্স (hydroponics), এরোপনিক্স(Aeroponics) পার্লাইট ও ভার্মিকুলাইট নারকেলের ছোবড়া বা কোকোপিট (Coco Peat)পাথরের কুচি বা ইটের খোয়া শ্যাওলা (Sphagnum Moss) বর্তমানে বহু প্রচলিত।

বিছুটিতে হাত দিলে হাত চুলকায় কেন?

বিছুটি পাতার গায়ে থাকা অত্যন্ত সূক্ষ্ম ও ধারালো রোমগুলো মূলত এক একটি প্রাকৃতিক ইনজেকশনের মতো কাজ করে। যখনই এই পাতায় স্পর্শ লাগে, রোমের ভঙ্গুর ডগাগুলো ভেঙে গিয়ে ত্বকের গভীরে সূঁচের মতো ঢুকে পড়ে। এই রোমগুলোর ভেতর থেকে তখন ফরমিক অ্যাসিড, হিস্টামিন এবং অ্যাসিটাইলকোলিনের মতো কিছু শক্তিশালী রাসায়নিক তরল আমাদের ত্বকে মিশে যায়। এই রাসায়নিকগুলো সরাসরি স্নায়ুর ওপর বিক্রিয়া করে তীব্র জ্বালাপোড়া ও চুলকানির সৃষ্টি করে, যা মূলত শত্রুর হাত থেকে বাঁচার জন্য এই গাছের একটি অনন্য আত্মরক্ষা কৌশল।

বনসাই তৈরি করতে কিভাবে একটি গাছের বৃদ্ধিকে আটকে দেওয়া হয়?

বনসাই তৈরির মূল কৌশল হলো গাছের স্বাভাবিক বৃদ্ধিকে পুরোপুরি বন্ধ না করে সেটিকে অত্যন্ত ধীরগতিতে এবং একটি নির্দিষ্ট কাঠামোর মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা। এটি মূলত কিছু বৈজ্ঞানিক ও উদ্যানতত্ত্ব কৌশলের সমন্বয়। প্রথমত, গাছের বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণের প্রধান কাজ শুরু হয় তার শেকড় থেকে। একটি ছোট পাত্রে গাছকে আটকে রেখে নিয়মিত বিরতিতে তার মূল শেকড় বা ট্যাপ রুট ছেঁটে ফেলা হয়। এর ফলে গাছটি মাটির গভীর থেকে অনেক বেশি পুষ্টি সংগ্রহ করতে পারে না, যা তার ডালপালা বড় হওয়ার ক্ষমতা কমিয়ে দেয়। দ্বিতীয়ত, গাছের ডালপালা এবং কুঁড়ি নিয়মিত ছাঁটাই (Pruning) করা হয়। যখনই নতুন কোনো ডাল বা পাতা বড় হতে শুরু করে, তখনই তা কেটে দেওয়া হয় যাতে গাছের শক্তি বড় হওয়ার বদলে কান্ডকে মোটা ও মজবুত করতে ব্যয় হয়। এছাড়া তার বা ওয়্যার (Wiring) ব্যবহারের মাধ্যমে ডালগুলোকে নির্দিষ্ট দিকে বাঁকিয়ে দেওয়া হয়, যা গাছের কোষের স্বাভাবিক প্রসারণে বাধা দেয় এবং সেটিকে বামন আকৃতি দেয়। সবশেষে, গাছটিকে খুব সামান্য পরিমাণে পুষ্টি বা সার এবং নিয়ন্ত্রিত পানি দেওয়া হয়। এটি গাছকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য যথেষ্ট হলেও তাকে বনের বিশাল গাছের মতো বাড়তে দেয় না। এই নিরন্তর পরিচর্যার মাধ্যমেই একটি বিশাল প্রজাতির গাছকেও বছরের পর বছর ছোট্ট একটি পাত্রে সাজিয়ে রাখা সম্ভব হয়।

বাতিল নোট থেকে জ্বালানি তৈরি করা যায় কি?

বহু ব্যবহারে জীর্ণ হয়ে যাওয়া নোটগুলো একটা যন্ত্রে ফেলে ছোট ছোট ব্রিকেট বা ইঁট তৈরি করা যায় । এক একটি নোটের ইট হয় প্রায় ৩০০ গ্রাম ওজনের। ৯০০ গ্রাম ওজনের তিনটে ইঁটের জ্বালানি মূল্য এক লিটার ফার্নেশ অয়েলের সমান। এছাড়াও এই ধরনের কাগুজে ইট থেকে হাতে তৈরি কাগজ, প্যাকেজিং-এর বাক্স, হার্ড বোর্ড ইত্যাদি বানানো যায়। তাহলে বাতিল হয়ে যাওয়া নোটের আবর্জনা থেকে সম্পদ সৃষ্টির একটা উপায় পাওয়া গেল!

অ্যাগোরাফোবিয়া কি?

একসঙ্গে প্রচুর লোক-লস্কর বা বিরাট মিটিং মিছিল দেখলে তার থেকে এক ধরনের মানসিক আতঙ্ক তৈরি হলে তাকে বলে অ্যাগোরাফোবিয়া। সাধারণত মহিলাদের মধ্যেই এই ধরনের ফোবিয়া বেশি দেখা যায়।

এই সঙ্গে জেনে নিই-এক্রোফোবিয়া, ট্রাইপ্যানফোবিয়া, নিটোফোবিয়া, হাইডোফোবিয়া, অ্যারাক্সাফোবিয়া ও ক্লস্ট্রোফোবিয়া কি?

এক্রোফোবিয়া- বহুতল বাড়ি বা উঁচু জায়গা থেকে নিচের দিকে তাকালে আতঙ্কিত হওয়াই এক্রোফোবিয়া। ট্রাইপ্যানফোবিয়া- রক্ত বা ইনজেকশনের সিরিঞ্জ দেখেই আতঙ্কিত হওয়ার

নিকটোফোবিয়া- অনেকেই গুহা বা গুহায় ঢুকতে বা দেখতে ভয় পান। এই ধরনের ভয়কে বলে নিকটোফোবিয়া।
সাইনোফোবিয়া- কুকুর দেখে আতঙ্কিত হওয়া।
হাইড্রোফোবিয়া- পানি দেখলে বা পানিতে নামলে বা নৌকো, স্টিমার বা অন্য জলযানে চড়তে আতঙ্কিত হওয়ার নামই হাইড্রোফোবিয়া।
অ্যারাক্রোফোবিয়া- মাকড়সা দেখে ভয়ে আতঙ্কিত হওয়া।
ক্লস্ট্রোফোবিয়া- রাস্তার ভিড়ে চাপাচাপি থেকে আতঙ্কিত হওয়ার নামই ক্লস্ট্রোফোবিয়া।

নার্ভ গ্যাস কি?

এটি আরেকটি রাসায়নিক মারণাস্ত্র। একধরনের অরগ্যানো ফসফেট যৌগ। অ্যাসিটাইলকোলিন এস্টারেজ নামে একধরনের উৎসেচকের ক্ষরণে তীব্র বাধা সৃষ্টি করে। নার্ভ বা স্নায়ু এবং পেশীসমূহের কাজ করার জন্য ঐ উৎসেচকটি অতীব প্রয়োজনীয়। অল্প মাত্রায় নার্ভ গ্যাস প্রয়োগ করলেই মানুষ সাময়িক দৃষ্টি হারাতে পারে, শ্বাসকষ্ট, মুখ দিয়ে লালা ঝরা, মাথাধরা, এই ধরনের নানা উপসর্গ দেখা যায়। বেশি মাত্রায় নার্ভ গ্যাস শ্বাসপ্রশ্বাস বন্ধ করে দিতে পারে।

একটি প্রপেলার বিমান কেন একটি জেট বিমানের মত অনেক উঁচুতে উড়তে পারে না?

প্রপেলার বিমান মূলত ঘন বাতাসের ওপর নির্ভর করে এগিয়ে চলে, কারণ এর পাখাগুলো বাতাসকে পেছনে ঠেলে সামনের দিকে বল বা থ্রাস্ট তৈরি করে। উচ্চতা বাড়ার সাথে সাথে বায়ুমণ্ডলের ঘনত্ব কমে পাতলা হয়ে যায়, ফলে প্রপেলার কাটার মতো পর্যাপ্ত বাতাস পায় না এবং বিমানটি তার প্রয়োজনীয় গতি ও উচ্চতা ধরে রাখতে ব্যর্থ হয়। এছাড়া প্রপেলার বিমানের ইঞ্জিনে জ্বালানি পোড়ানোর জন্য প্রচুর অক্সিজেনের প্রয়োজন হয়, যা উচ্চাকাশে অত্যন্ত সীমিত। অন্যদিকে, জেট ইঞ্জিন পাতলা বাতাসকে নিজের ভেতরে উচ্চ চাপে সংকুচিত করে নিতে পারে এবং অনেক দ্রুত গতিতে চলতে পারে, যা প্রপেলার বিমানের পক্ষে সম্ভব হয় না। একারণেই প্রপেলার বিমানকে সাধারণত বায়ুমণ্ডলের নিচের স্তরেই সীমাবদ্ধ থাকতে হয়।

কাঠ পোড়ালে ধোঁয়া হয়, কিন্তু কাঠকয়লা পোড়ালে তা হয় না কেন?

সাধারণত সমস্ত দাহ্য পদার্থই পুড়ে গেলে কার্বন-ডাই-অক্সাইড ও বাষ্প উৎপন্ন হয়। কখনও কখনও কয়েকটি দাহ্য পদার্থ সম্পূর্ণ পোড়ে না। কারণ, সেই সব পদার্থে থাকে এমন কিছু বস্তুর উপস্থিতি বা যথেষ্ট পরিমাণে অক্সিজেনের অনুপস্থিতি। কাঠে থাকে সেলুলোজ তন্তু, ওয়াক্স অথবা রেজিন বা রজন। আর থাকে কিছু উদ্বায়ী তেল- যা পোড়ে না। এজন্য কাঠের সম্পূর্ণ দহন সম্ভব হয় না। ফলে ধোঁয়া উৎপন্ন হয়। কিন্তু কাঠকয়লা হলো বিশুদ্ধ কার্বন। আর কোনও বস্তুর উপস্থিতি সেখান নেই। তাই কাঠকয়লার দহন সম্পূর্ণ হওয়ার ফলে ধোঁয়া উৎপন্ন হয় না।

কুকুর, বিড়াল ও বন্য জানোয়ারের চোখ রাতে জ্বলজ্বল করে কেন?

মানুষের মতোই কুকুর, বিড়াল ও বন্য প্রাণীদের চোখে দেখার জন্য ক্যামেরার লেন্সের মতোই রডের আকারে কোষ থাকে। এছাড়াও চোখের পিছনের দেয়ালে থাকে স্ট্যাপেটাম নামক পদার্থ। এই পদার্থ থেকে এক ধরনের উজ্জ্বল আলো চোখের পর্দায় প্রতিফলিত হতে থাকে। এই জন্য ওই প্রাণীদের চোখ জ্বলছে মনে হয়। এই রঙের বিভিন্নতাও থাকে।

লাই ডিটেকটরে মিথ্যা কথা ধরা পড়ে- কেমন করে?

দেখা গেছে কেউ যখন মিথ্যা কথা বলেন, তখন তার দেহে কিছু পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। যেমন শ্বাস-প্রশ্বাস চলে দ্রুত, হৃৎস্পন্দন দ্রুত হয় ইত্যাদি, ইত্যাদি। লাই ডিটেকটর মেশিন দেহের বিভিন্ন জায়গায় সংযুক্ত থাকে। প্রশ্নকর্তার প্রশ্নের উত্তরে মিথ্যে বললেই ঐ যন্ত্র দেহের অবস্থার গতিবিধি পর্যালোচনা করে জানিয়ে দেবে কথাটি আদৌ বিশ্বাসযোগ্য কি না। অবশ্য এই লাই ডিটেকটরও কেবলমাত্র শতকরা ৮০ ভাগ ঠিক কাজ দেয়। পেশাদার ক্রিমিনালরা নিজের আবেগ সম্বরণ করে যন্ত্রটাকেই ভুল প্রমাণ করে দিতে পারে।

শরীরের সব অঙ্গ প্রত্যঙ্গ কি দান করা সম্ভব?

সব অঙ্গ দান করা সম্ভব হয় না। মানুষের মস্তিষ্ক দান বা প্রতিস্থাপন করা অসম্ভব, কারণ এটি আমাদের স্মৃতি, ব্যক্তিত্ব এবং চেতনার আধার। এছাড়া মস্তিষ্কের লক্ষ লক্ষ স্নায়ু সংযোগ বিচ্ছিন্ন করার পর পুনরায় অন্য শরীরে জোড়া লাগানো

বর্তমান চিকিৎসাবিজ্ঞানের নাগালের বাইরে। অন্যদিকে, প্লীহা (Spleen), পিত্তথলি (Gallbladder) বা অ্যাপেন্ডিক্সের মতো অঙ্গগুলো শরীরের জন্য অপরিহার্য বা 'ভাইটাল' নয় বলে এগুলো প্রতিস্থাপনের প্রয়োজন পড়ে না। আবার চোখের ক্ষেত্রে কর্নিয়া প্রতিস্থাপন করা গেলেও পুরো চোখ দান করা যায় না, কারণ চোখের অপটিক নার্ভ বা দৃষ্টি স্নায়ু একবার কাটা পড়লে তা মস্তিষ্কের সাথে পুনরায় জুড়ে দেওয়া এখনো সম্ভব হয়নি।

মরণোত্তর দেহদান একটি অবশ্য কর্তব্য হওয়া উচিত কেন?

কারণ আধুনিক চিকিৎসাশাস্ত্র দান করা দেহ থেকে পেতে পারে দুর্লভ কর্নিয়া, হৃৎপিণ্ড, বৃক্ক, ফুসফুস, অগ্ন্যাশয়, যকৃৎ, হাড়, মজ্জা, গর্ভাশয় এমনকি চামড়া। এতে করে ডাক্তারী ছাত্রদের শিক্ষার সুবিধা হবে। মৃতদেহ থেকে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সংগ্রহ করে প্রয়োজনে অসুস্থের শরীরে সংস্থাপন করে সুস্থ করে তোলা যেতে পারে। সেই ১৮৩২ সালে প্রখ্যাত বিজ্ঞানী জেরমে বেসুমল ওঁর দেহটিকে দান করেছিলেন। তারপর থেকেই এই প্রথা প্রচলিত হয়ে আছে।

প্রাণীজগতে কারা সবচেয়ে দ্রুত বর্ণ পরিবর্তন করতে পারে?

প্রাণিজগতে সবচেয়ে দ্রুত রং পরিবর্তন করতে পারে সেফালোপড শ্রেণির প্রাণীরা, যাদের মধ্যে অক্টোপাস, স্কুইড এবং কাটলফিশ অন্যতম। গিরগিটির তুলনায় এরা অনেক বেশি দ্রুত এবং মাত্র কয়েক মিলিসেকেন্ড বা এক সেকেন্ডের কম সময়ে নিজেদের গায়ের রঙ ও নকশা বদলে ফেলতে পারে । এদের ত্বকের নিচে ক্রোমাটোফোর নামক বিশেষ রঞ্জক কোষ থাকে যা সরাসরি স্নায়ুতন্ত্রের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রিত হয়, ফলে পেশি সংকোচনের মাধ্যমে এরা মুহূর্তেই চারপাশের পরিবেশের সাথে মিশে যেতে পারে। এই অবিশ্বাস্য গতির কারণেই এদেরকে প্রকৃতির সেরা ছদ্মবেশী শিকারি হিসেবে গণ্য করা হয়।

ইকোলোকেশন কি?

ইকোলোকেশন (Echolocation) হলো শব্দতরঙ্গের প্রতিফলনের মাধ্যমে কোনো বস্তুর অবস্থান, দূরত্ব এবং আকার নির্ণয় করার একটি প্রাকৃতিক পদ্ধতি। বাদুড়, ডলফিন এবং তিমির মতো প্রাণীরা অন্ধকারে বা ঘোলা পানিতে চলাফেরা ও শিকার ধরার জন্য এই কৌশল ব্যবহার করে। এই পদ্ধতিতে প্রাণীটি প্রথমে উচ্চ কম্পাঙ্কের শব্দ বা 'ক্লিক' তৈরি করে বাতাসে বা পানিতে ছড়িয়ে দেয়, যা কোনো বস্তুতে বাধা পেয়ে প্রতিধ্বনি (Echo) হিসেবে ফিরে আসে। সেই প্রতিধ্বনি বিশ্লেষণ করেই প্রাণীরা বুঝতে পারে সামনে থাকা বস্তুটি কত দূরে, সেটি কত দ্রুত চলছে বা সেটি কি তাদের খাবার নাকি কোনো বাধা। মূলত দৃষ্টিশক্তির সীমাবদ্ধতা কাটিয়ে শব্দের সাহায্যে পারিপার্শ্বিক পরিবেশের একটি নিখুঁত চিত্র তৈরি করাই হলো ইকোলোকেশন।

কেন শুধুমাত্র লোহাতেই চুম্বকীয় গুণ বেশি দেখা যায়?

লোহাতে চৌম্বকীয় গুণ বেশি দেখা যাওয়ার প্রধান কারণ হলো এর পরমাণুর গঠন এবং 'ডোমেইন' (Domain) নামক বিশেষ বিন্যাস। লোহার প্রতিটি পরমাণু নিজেই একটি ক্ষুদ্র চুম্বকের মতো কাজ করে, কারণ এর ইলেকট্রনগুলো এমনভাবে ঘোরে যা একটি নির্দিষ্ট চৌম্বক ক্ষেত্র তৈরি করে। সাধারণ অবস্থায় লোহার ভেতরে এই পরমাণুগুলো এলোমেলোভাবে থাকে, কিন্তু যখনই কোনো চৌম্বক ক্ষেত্রের সংস্পর্শে আসে, তখন লোহার ভেতরের কোটি কোটি পরমাণু মুহূর্তের মধ্যে একই দিকে সারিবদ্ধ হয়ে বড় শক্তিশালী চুম্বকে পরিণত হয়। এই বিশেষ বৈশিষ্ট্যকে বিজ্ঞানের ভাষায় 'ফেরোম্যাগনেটিজম' (Ferromagnetism) বলা হয়, যা লোহা ছাড়াও নিকেল ও কোবাল্টের মধ্যে দেখা যায়। তবে লোহার পারমাণবিক গঠন এই সারিবদ্ধ হওয়ার প্রক্রিয়াকে অন্য যেকোনো ধাতুর চেয়ে অনেক বেশি সহজ ও শক্তিশালী করে তোলে বলেই লোহাতে চুম্বকীয় আকর্ষণ ও গুণ সবথেকে বেশি প্রকাশ পায়।

নুসরাত জাহান নাবিলা
কৃষি অনুষদ
ব্যাচ: ২২
শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়

স্মৃতির বাতায়ন

আমি নাবিলা...

তোমাদের সবার সাথে একটা ছোট্ট গল্প শেয়ার করি। তখন আমি খুব ছোট, ক্লাস সিক্সে পড়ি। আমাদের স্কুলে একটি আর্ট কম্পিটিশন হয়েছিল। কম্পিটিশন টি হোস্ট করেছিলেন ভার্সিটির কয়েকজন আপু ও ভাইয়া। তাদের কথাবার্তার ধরণ, আমাদের সাথে খুনসুটি, ছোট ছোট গল্প শেয়ার সবকিছুই আমাকে ভীষণভাবে আকৃষ্ট করেছিল। আমাদের ডানাকাটা স্বপ্নগুলো তারা নিজেদের ঝুলিতে ভরে নিয়ে গিয়েছিলেন, আর আমাদের মাঝে রেখে গিয়েছিলেন তাদের অভিজ্ঞতার কিছু রঙিন খণ্ডচিত্র।

আজ আমি নিজেও বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ি। আমার অভিজ্ঞতার ঝুলিটা হয়তো খুব ভারী নয়, তবে এতে কিছু রং, কিছু আনন্দ আর কিছু জ্ঞান যোগ করেছে বাংলাদেশ বায়োলজি অলিম্পিয়াড। ২০২৪ সালে প্রথমবার আমি বাংলাদেশ বায়োলজি অলিম্পিয়াডে অংশগ্রহণ করি। এ সারথির সাথে পথ চলতে গিয়ে আমার পরিচয় হয়েছে অনেক শুভ্র মনের মানুষের সাথে।

তবে আমার জন্য সবচেয়ে সুন্দর অভিজ্ঞতা ছিল বিভিন্ন স্কুল-কলেজে গিয়ে ক্যাম্পেইন করা। কেননা সেখানে গিয়ে আমি ছোট ছোট কোমলমতি শিক্ষার্থীদের মনের রংগুলো জানতে পেরেছি। তাদের সুপ্ত প্রতিভা, জানার আগ্রহ আর জানানোর ইচ্ছা আমাকে প্রতিনিয়ত বিমোহিত করেছে। কখনো কখনো তাদের সাথে কথা বলতে বলতে আমি ভুলেই যেতাম যে আমি হয়তো তাদের থেকে বড়।

স্কুল-কলেজের স্মৃতি কেউই ভুলতে পারে না আমার ক্ষেত্রেও তাই। আর সেই নিষ্পাপ প্রাণগুলো খুব সহজেই মানুষকে আপন করে নিতে পারে, যেমনটা তারা করে নিয়েছিল আমাকে.... আমাদেরকে। অবশ্য এই পুরো কৃতিত্বই- বাংলাদেশ বায়োলজি অলিম্পিয়াড-এর।

সর্বোপরি, অভিজ্ঞতা আমার কাছে বাতিঘরের মতো। যা চলার পথ আলোকিত করে, আর করে মসৃণ- কান্ডারীর হোঁচট খাওয়ার সম্ভাবনা হয়তো অনেকটাই কমিয়ে দেয়।

নুসরাত জাহান নাবিলা
কৃষি অনুষদ
ব্যাচ: ২২
শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়

দ্য ডেল্টা ল্যাটিস

প্রথম অধ্যায়

রাত ২টা ৪৭ মিনিট। শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং ভবনের দোতলার ল্যাবটা এখন এক টুকরো বিচ্ছিন্ন দ্বীপ। শায়লা মেহজাবিন তার মাইক্রোস্কোপের লেন্স থেকে চোখ সরাতে পারছেন না। পরাজয় শব্দটা ডিকশনারি থেকে মুছে ফেলেছেন তরুণ বিজ্ঞানী শায়লা মেহজাবিন। তার বাবা উপকূলের নোনা ধরা জমিতে আমৃত্যু লড়াই করে গেছেন, সেই স্মৃতিই শায়লার ভেতরে এক জ্বলন্ত বারুদ হয়ে কাজ করে। তার চোখের নিচে কালচে ছায়া, কিন্তু দৃষ্টিতে ইস্পাতের দৃঢ়তা।

"তানিয়া, একটু কফি হবে?" শায়লার ফিসফিসানি নিস্তব্ধতা ভাঙল।

তানিয়া, এই টিমের সিনিয়র রিসার্চার এবং শায়লার সবচেয়ে পুরোনো বন্ধু। তানিয়া শান্ত, ধীরস্থির এবং যেকোনো বিপদে বরফের মতো ঠান্ডা থাকতে পারে । সে ল্যাবের কোণে রাখা কফি মেকার থেকে এক কাপ ধোঁয়া ওঠা কফি এগিয়ে দিল। "তোর স্যাম্পল কি বলে, শায়লা?"

শায়লা স্ক্রিনের দিকে ইশারা করল....তানিয়ার হাত থেকে কফির কাপটা ফসকে গেল, পড়েই যাচ্ছিল, মূহুর্তেই নিজেকে সামলে নিলো সে। স্ক্রিনে যে হেক্সাগোনাল ল্যাটিস এর ছবি ভাসে,এটা কি তার চোখের ভুল? চোখটা কচলে নিলো সে। "Unbelievable!!" এগুলো Non-canonical (ncAAs) প্রোটিন! প্রকৃতিতে এটা ইম্পসিবল!"

পেছনের ডেস্ক থেকে ঋতু মুখ তুলল। ঋতু এই টিমের সবচেয়ে কনিষ্ঠ সদস্য, জেনোম সিকোয়েন্সিংয়ে পটু সে, চঞ্চল প্রাণবন্ত একটা মেয়ে । কিন্তু এখন পরিস্থিতি ভিন্ন,কিসে যেন তার চোখ আতঙ্কে ছেয়ে ফেলেছে। "আপু, আমি জেনোমের ভেতর যে সিগনেচার পাচ্ছি, তা কোনো পরিচিত অ্যালগরিদম মানছে না। মনে হচ্ছে কেউ একজন ডিএনএ-র ভেতর নতুন কোনো কোডিং ল্যাঙ্গুয়েজ লিখে দিয়েছে।"

ঠিক সেই মুহূর্তে ল্যাবের অন্ধকার করিডোর থেকে একটা অট্টহাসি শোনা গেল। আরিয়ান ভেতরে ঢুকল । আরিয়ান বায়ো-ইনফরমেটিক্স স্পেশালিস্ট, তার মাথার চুল ভর্তি অবাধ্য জট আর মুখে এক তাচ্ছিল্যের হাসি। "তোরা এখনো ল্যাটিস নিয়ে পড়ে আছিস? বাইরে সাউ-এর মেইন সার্ভারে হ্যাকিং অ্যালার্ট বেজে উঠেছে। কেউ একজন আমাদের ল্যাবের আইপি অ্যাড্রেস থেকে ডেটা চুরি করার চেষ্টা করছে।"

শায়লা এবার তাদের দিকে ঘুরে সোজা হয়ে দাঁড়াল । "আমাদের সময় ফুরিয়ে আসছে। প্রকৃতি আর কর্পোরেট লবিস্ট, দুই পক্ষই এখন আমাদের দরজায়।" কথাটা বলে কিছুক্ষণ আনমনে থেকে ডায়েরিতে চট করে কি একটা লিখে ফেলল...

দ্বিতীয় অধ্যায়

পরদিন সকাল,

পিনপতন নীরবতা বিরাজ করছে,রীতিমতো এক বিচারালয়ে পরিণত হয়েছে কন্ফারেন্স রুমটা। ডক্টর রাশিদ__বিভাগীয় প্রধান, তার গম্ভীর ভরাট গলায় 'কাল্পনিক উপন্যাস' বলে উড়িয়ে দিতে চাইলেন শায়লার গবেষণাকে। রাশিদ সাহেব প্রথাগত বিজ্ঞানে বিশ্বাসী, কোনো নতুনত্ব তার কাছে বিশৃঙ্খলা মনে হয়।

"শায়লা, তুমি কি জানো তুমি কী বলছ?" রাশিদ সাহেব হুঙ্কার দিলেন। "ডারউইনিজমকে এভাবে অপমান করার সাহস তুমি কোথায় পেলে?"

শায়লার হয়ে উত্তর দিল প্রফেসর জামান। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের এমিরিটাস প্রফেসর, বয়স অনেক হয়েছে, কিন্তু তার মস্তিষ্কের ক্ষমতার কাছে এখনো যেকোনো সুপার-কম্পিউটার হার মানতে বাধ্য। তিনি জানালার দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসলেন। "রাশিদ, বিজ্ঞান কখনো স্থির থাকে না। শায়লা যা পেয়েছে, তা হয়তো বিবর্তনের পরবর্তী অধ্যায়। তার মতে এটা Retrotransposon-mediated gene transfer। এটা যদি সত্যি হয়, রশিদ! তবে লবণাক্ততা আর আমাদের শত্রু থাকবে না।"

রুমের ভেতর উত্তেজনার পারদ চড়ল। আরিয়ান এক কোণে বসে তার ল্যাপটপে কী যেন টাইপ করছিল। হঠাৎ সে বলে উঠল, "স্যার, শুধু লবণাক্ততা নয়, এই গাছগুলো নিজেদের ভেতর একটা Bio-computational নেটওয়ার্ক তৈরি করছে। আমরা তাদের নিয়ন্ত্রণ করছি না, তারা আমাদের ডেটাবেস স্টাডি করছে।"

প্রফেসর জামান শায়লার চোখে চোখ রেখে দৃঢ় কণ্ঠে বললেন, "সাত দিন! আমি তোমাকে সাত দিন সময়

দিচ্ছি, আমাদের ল্যাবের 'সাউ-ধান-১০' জাতের ওপর এই Lattice-Drive সফলভাবে প্রয়োগ করার জন্য। হারলে তোমার ক্যারিয়ার শেষ।"
সেমিনার শেষে ডক্টর রাশিদ শায়লাকে একা দেখা করতে বললেন। সেখানে বসে ছিল 'অ্যাগ্রো-জেন' কর্পোরেশনের রিপ্রেজেন্টেটিভ মি. খান। "শায়লা মেহজাবিন, এই রিসার্চের পেটেন্ট আমাদের দিন। উপকূলের মানুষ মরছে মরুক, আপনার ক্যারিয়ার আর টাকা নিরাপদ থাকলেই তো হলো!"
শায়লা মেহজাবিন মি. খানের চোখের দিকে তাকিয়ে খুব শান্ত স্বরে বলল, "আমার বাবা নোনা জলে দাঁড়িয়ে মারা গেছেন। আমি তার রক্ত বিক্রি করতে শিখিনি।"

তৃতীয় অধ্যায়

পঞ্চম দিন। ল্যাবের ভেতর হঠাৎ একটা তীব্র সাইরেন বাজল। কুলিং সিস্টেম ফেল করেছে! আরিয়ান পাগলের মতো কিবোর্ড চাপছে। "শায়লা! কেউ লজিক বম্ব দিয়ে আমাদের সিস্টেম ক্র্যাশ করিয়েছে। ইনকিউবেটরের টেম্পারেচার ৪২ ডিগ্রি ক্রস করছে!"
ঋতু আতঙ্কিত কণ্ঠে বলে উঠলো "সব প্রোটিন নষ্ট হয়ে যাবে!"
তানিয়া এক মুহূর্ত দেরি না করে ল্যাবের অগ্নিনির্বাপক যন্ত্র নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল। শায়লা লক্ষ্য করল অদ্ভুত এক দৃশ্য। ইনকিউবেটরের ভেতরের নীল আভাটা তীব্রতর হচ্ছে। ল্যাটিসগুলো তাপে ভেঙে পড়ার বদলে আরও ঘন হচ্ছে। তারা যেন তাপ থেকে এনার্জি শুষে নিচ্ছে।
শায়লা চিৎকার করে উঠল "আরিয়ান, আইটি প্যানেল ছাড়ো! "দেখো! গাছগুলো নিজেরাই সিস্টেম রিবুট করছে। তারা হ্যাকারদের কোডকে নিজেদের প্রয়োজনে রি-রাইট করে ফেলছে!"
মিনিট দশেক পর ল্যাবের এসি আবার সচল হলো। কিন্তু এবার এসি নিয়ন্ত্রণ করছে আরিয়ান নয়, বরং ল্যাবের চারাগুলো। ল্যাটিস প্রোটিনগুলো এখন এক ধরণের Bio-antenna হিসেবে কাজ করছে।

চতুর্থ অধ্যায়

সাত দিনের মাথায় ল্যাবে যখন প্রফেসর জামান আর ডক্টর রাশিদ ঢুকলেন, তখন বাইরে কালবৈশাখীর মেঘ জমছে। ৪২ dS/m লবণাক্ততা। লোনা জলের সেই পাত্রে ধানের চারাগুলো রাখা।
মিনিট পাঁচেক পার হলো। চারাগুলো কেবল টিঁকেই থাকল না, বরং তাদের থেকে একটা তীব্র ইলেকট্রোম্যাগনেটিক পালস বের হতে লাগল। ল্যাবের মনিটরগুলোতে উপকূলের রিয়েল-টাইম ম্যাপ ফুটে উঠল। আরিয়ান স্তম্ভিত হয়ে বলল, "আপু! এরা উপকূলের সব কটি নোডের সাথে কানেক্ট হচ্ছে। এরা পৃথিবীর সব গাছকে একটা সংকেত দিচ্ছে 'be Ready'।"
ডক্টর রাশিদ আতঙ্কিত হয়ে পিছু হঠলেন। "কিল-সুইচ চাপো, শায়লা! দিস ইজ আউট অফ কন্ট্রোল!"
শায়লা রেড বাটনের ওপর আঙুল রাখল। সে দেখল তানিয়া আর ঋতুর চোখে জল। সে জানালার দিকে তাকাল। তার বাবার মুখটা ভেসে উঠল। প্রকৃতি আজ মানুষের কাছে দয়া ভিক্ষা করছে না, সে মানুষের কাঁধে হাত রেখে নতুন এক পৃথিবীর ডাক দিচ্ছে।
শায়লা আঙুল সরিয়ে নিল। "না স্যার, আমি মারব না ।"
গল্পের শেষে শায়লা মেহজাবিন সাউ-এর সেই বিশাল গবেষণা মাঠে দাঁড়িয়ে আছে। বাইরে মি. খান আর পুলিশ দাঁড়িয়ে আছে তাকে গ্রেফতারের জন্য। কিন্তু শায়লা হাসল। সে এক মুঠো সেই নীলচে বীজ বাতাসের দিকে উড়িয়ে দিল। কালবৈশাখীর ঝোড়ো হাওয়া সেই বীজগুলোকে নিয়ে ছড়িয়ে পড়ল উপকূলের দিকে।
পুব আকাশে সূর্য উঠছে। সেই প্রথম কিরণ যখন ধানক্ষেতের নীল ল্যাটিসের ওপর পড়ল, তখন মনে হলো পুরো বাংলাদেশ এক বিশাল জীবন্ত হীরা হয়ে জ্বলছে। আরিয়ানের ল্যাপটপে শেষ মেসেজটা পপ-আপ করল: "Protocol Activated. Connection Secure."
শায়লা বিড়বিড় করে বলল, "আমরা এখন কেবল সাক্ষী হয়ে থাকলাম।"

"সমাপ্ত"

আয়েশা সিদ্দিকা
কৃষি অনুষদ
ব্যাচ: ২৩
শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়

জীববিজ্ঞান অলিম্পিয়াডের প্রচারণায় এক স্মরণীয় দিন

আমি এর আগে কখনো স্কুলে গিয়ে কোনো ক্যাম্পেইন করিনি। জীববিজ্ঞান অলিম্পিয়াড নিয়ে ঢাকার বিভিন্ন স্কুলে যাওয়া অন্যরকম এক অভিজ্ঞতা। এটা ছিল বেশ উত্তেজনাপূর্ণ। প্রথমে আমার একটু নার্ভাস লাগছিল। কারণ আমার সঙ্গে কেউ পরিচিত ছিল না। কিন্তু আমার সঙ্গে যারা ছিল তারা খুবই ভালো ছিল। তারা খুব আন্তরিক ছিল। তাদের সঙ্গে কথা বলে আমার নার্ভাস ভাবটা কেটে গেল।

প্রথমে আমরা অক্সফোর্ড ইন্টারন্যাশনাল স্কুলে গেলাম। সেখানকার শিক্ষকরা খুবই ভালো ছিলেন। তারা খুব আন্তরিক ছিলেন। পরে আমরা মোহাম্মদপুর মডেল স্কুলে গেলাম। সেখানকার শিক্ষকদের সঙ্গে কথা বললাম। তাদেরকে পোস্টার দিলাম। তারা বললেন তিনি সবাইকে জীববিজ্ঞান অলিম্পিয়াডের কথা বলবেন। তারা খুবই আন্তরিক ছিলেন।

এরপর ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজে গেলাম। সেখানে ছাত্রদের সঙ্গে সরাসরি কথা বলার সুযোগ হলো। প্রতিটি ক্লাসে গিয়ে জীববিজ্ঞান অলিম্পিয়াডের কথা বললাম। সবাইকে অংশগ্রহণ করতে বললাম। ওখানকার ছাত্ররা খুবই আগ্রহী ছিল।

মোহাম্মদপুর সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়েও ভালো সাড়া পেয়েছি। শিক্ষক ও ছাত্ররা খুব সহযোগিতা করেছে।

সবশেষে আমরা কিশলয় গার্লস হাই স্কুলে গেলাম। কিন্তু সেখানে এসএসসি পরীক্ষা চলছিল। তাই সেখানে প্রচারণা করা হলো না।

সারাদিনের অভিজ্ঞতা আমার ভালো লেগেছে। আমি গর্ববোধ করি যে জীববিজ্ঞান অলিম্পিয়াডের কথা বলতে পেরেছি। আমার মধ্যে একটা নতুন আত্মবিশ্বাস তৈরি হয়েছে।

অরূপ কর্মকার প্রিয়
কৃষি অনুষদ
ব্যাচ: ২৩
শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়

মিউটেশন পরিবর্তনের অদৃশ্য কবিতা

(জীবনের এক নীরব রূপান্তরের গল্প)

"পরিবর্তনই জীবনের একমাত্র অপরিবর্তনীয় সত্য—আর সেই পরিবর্তনের অতি সূক্ষ্মতম ছোঁয়া লুকিয়ে আছে আমাদের জিনে।"

রাতের আকাশে ছড়িয়ে থাকা অসংখ্য নক্ষত্রের মতো, আমাদের প্রতিটি কোষের ভেতরে লুকিয়ে আছে এক একটি গল্প। আর সেই গল্পের ভাষা হলো DNA—জীবনের নকশা। এই নকশায় যখন সূক্ষ্ম কোনো পরিবর্তন ঘটে, তখনই জন্ম নেয় এক রহস্যময় প্রক্রিয়া—মিউটেশন।
মিউটেশন মানে শুধু পরিবর্তন নয়, এটি এক নিঃশব্দ বিপ্লব। DNA-এর অক্ষরে অক্ষরে যখন সামান্যতম হেরফের হয়, তখন তার প্রতিধ্বনি পৌঁছে যায় আমাদের শরীর, বৈশিষ্ট্য, এমনকি ভবিষ্যৎ প্রজন্ম পর্যন্ত। যেন এক অদৃশ্য লেখক, নিঃশব্দে নতুন করে লিখে যাচ্ছে জীবনের গল্প।

চলুন মিউটেশনের নিঃশব্দ জাদু কবিতার ছোঁয়ায় অনুভব করা যাক- যেখানে DNA-র প্রতিটি কোষ লেখক আর প্রতিটি পরিবর্তন এক একটি ছন্দ।

নিঃশব্দ জিনের ভাঁজে বদলায় জীবনের ভাষা,
অদেখা ছোঁয়ায় জেগে ওঠে নতুন এক ভবিষ্যতের আশা,
যা আমরা বলি ভুল - প্রকৃতির কাছে তা এক নতুন দিশা,
মিউটেশনের আঁচড়ে লেখা হয় নতুন সৃষ্টির ভাষা।

এই পরিবর্তন কখনো আসে ভুলের মাধ্যমে—DNA কপি হওয়ার সময় ছোট্ট একটি ত্রুটি। আবার কখনো আসে সূর্যের অতিবেগুনি রশ্মির আঘাতে, কখনো বা অদৃশ্য রাসায়নিক কিংবা ভাইরাসের প্রভাবে। কিন্তু কারণ যাই হোক, ফলাফল কিন্তু একটাই—নতুন কিছু সৃষ্টি।
আমরা প্রায়ই মিউটেশনকে ভয় পাই। কারণ কিছু মিউটেশন সত্যিই রোগের কারণ হতে পারে, জীবনের স্বাভাবিক ছন্দকে বিঘ্নিত করতে পারে। তবে সব মিউটেশন অশুভ নয়। অনেক সময় এই পরিবর্তনই হয়ে ওঠে টিকে থাকার শক্তি, অভিযোজনের হাতিয়ার। প্রকৃতির কঠিন পরীক্ষায় যারা টিকে যায়, তাদের পেছনে থাকে এই ছোট ছোট পরিবর্তনের অবদান।
ভাবা যায়, আজকের এই বৈচিত্র্যময় জীবজগত—গাছ, প্রাণী, মানুষ—সবকিছুর পেছনেই রয়েছে অসংখ্য মিউটেশনের গল্প। প্রতিটি উপকারী পরিবর্তন প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে ছড়িয়ে পড়ে, গড়ে তোলে নতুন বৈশিষ্ট্য, কখনো কখনো সম্পূর্ণ নতুন প্রজাতি।

বাস্তব জীবনের এক নিঃশব্দ উদাহরণ
কিছু ব্যাকটেরিয়া অ্যান্টিবায়োটিকের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলে—এটি মিউটেশনের ফল।
আবার মানুষের ক্ষেত্রেও ল্যাকটোজ হজম করার ক্ষমতা এক ধরনের উপকারী মিউটেশনের উদাহরণ।

মিউটেশন শুধু একটি বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া নয়; এটি প্রকৃতির সৃষ্টিশীলতার প্রতীক। এটি শেখায়—পরিবর্তন মানেই ভয় নয়, পরিবর্তন মানেই সম্ভাবনা।
জীবনের এই দীর্ঘ যাত্রায় মিউটেশনই হলো সেই নীরব কবি, যে প্রতিনিয়ত লিখে যাচ্ছে বিবর্তনের অনন্ত কবিতা।

কানিজ ফাতেমা ফারিহা
কৃষি অনুষদ
ব্যাচ: ২৩
শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়

মাইক্রো-অ্যাভেঞ্জার্স: পোকামাকড়ের অবিশ্বাস্য সুপারপাওয়ার

আমরা প্রতিদিন অসংখ্য পোকামাকড় দেখি—কখনো বিরক্ত হয়ে তাড়িয়ে দেই, কখনো পায়ের নিচে পিষে ফেলি । কিন্তু কখনও কি ভেবে দেখেছি এই ক্ষুদ্র প্রাণীগুলোর ভেতরেও লুকিয়ে থাকতে পারে এমন সব ক্ষমতা, যা আমাদের চিন্তা ভাবনারও বাইরে । কেউ নিজের ওজনের বহু গুণ ভার বহন করতে পারে, কেউ অন্ধকারে নিখুঁতভাবে পথ খুঁজে নেয়, আবার কেউ রাসায়নিক অস্ত্র ব্যবহার করে শত্রুকে মুহূর্তেই পরাস্ত করতে পারে । সুপারপাওয়ার তো আমরা শুধু মার্ভেল, ডিসি ইউনিভার্সেই দেখে এসেছি। চলুন বাস্তব জীবনের কিছু সুপারপাওয়ার দেখে আসি ।

প্রকৃতির 'সুপারম্যান': হারকিউলিস বিটল! (Hercules beetle)

আমাদের কাছে সবচেয়ে শক্তিশালী সুপারহিরো কাকে মনে হয়, হাল্ক (Hulk) নাকি সুপারম্যান? সিনেমার পর্দায় তারা শক্তিশালী হলেও, আমাদের বাস্তবের পৃথিবীতেও পোকাদের জগতে এমন এক শক্তিশালী সুপারহিরো রয়েছে যার নাম 'হারকিউলিস বিটল'!

কেন একে সুপারহিরো বলা হয় জানো? হারকিউলিস বিটল নিজের শরীরের ওজনের চেয়ে প্রায় ৮৫০ গুণ বেশি ওজন তুলে নিতে পারে । অর্থাৎ হারকিউলিস বিটল যদি কোনো মানুষ হতো তাহলে সে অনায়াসেই নিজের হাত দিয়ে একটা মিলিটারি ট্যাংক উঠিয়ে নিতে পারত! তাহলে তো সে নিজেকে তাদের জগতের সুপারম্যান বা হাল্ক (hulk) দাবি করতেই পারে ।

প্রকৃতির আয়রনম্যান : বম্বার্ডিয়ার বিটল (Bombardier beetle)

আমরা রূপালী পর্দায় আয়রনম্যানকে প্রায়শই দেখি তার স্যুটের রেপালসর বিম ব্যবহার করে শত্রুকে ঘায়েল করতে । পোকামাকড়ের জগতেই ঠিক একই ক্ষমতার একজন রয়েছে যার নাম 'বম্বার্ডিয়ার বিটল'! এর পেটের ভেতরের এক বিশেষ চেম্বারে থাকে হাইড্রোজেন পারঅক্সাইড আর হাইড্রো কুইনোন নামের দুটি তরল পদার্থ। আর যখন কোনো শত্রু একে আক্রমণ করে, তখন ও এই দুটি পদার্থকে মিশিয়ে একটি বিস্ফোরক দ্রব্য তৈরি করে বিস্ফোরণ করে।

বিস্ফোরণের ফলে তৈরি হয় ফুটন্ত গরম বাষ্প, যার তাপমাত্রা ১০০ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মতো! আর ঠিক এই গরম বাষ্প ও বিষাক্ত তরলকে ও এক সেকেন্ডে ৫০০ পাল্‌স গতিতে স্প্রে হিসেবে ছুঁড়ে দেয় শত্রুর গায়ে। এটা যেন আস্ত একটা মিনি রকেট লঞ্চার, যা শত্রুকে এক মুহূর্তেই ঘায়েল করে দেয়!

আকাশপথের Hawkeye: ড্রাগনফ্লাই! (Dragonfly)

তোমরা কি জানো পৃথিবীর সবচেয়ে নিখুঁত শিকারি কে? বাঘ, সিংহ নাকি তীক্ষ্ণ নজরের ঈগল? এদের মধ্যে কেউ নয়। অবাক হলেও সত্যি যে, পৃথিবীর সবথেকে নিখুঁত শিকারী হলো রঙিন ডানার এক ছোট্ট ফড়িং বা ড্রাগনফ্লাই!

ড্রাগনফ্লাই পোকামাকড়ের জগতের 'হকআই' (Hawkeye) (মার্ভেল সুপারহিরো) যার লক্ষ্য কখনও মিস হয় না। ড্রাগনফ্লাই প্রকৃতির সেই সুপার শার্পশুটার যার শিকার ধরার সাফল্যের হার

অবিশ্বাস্য— প্রায় ৯৭%। অর্থাৎ, এরা একবার কোনো মশা বা মাছিকে টার্গেট করলে, ১০০ বারের মধ্যে ৯৭ বারই তাকে মাঝ আকাশেই ধরে ফেলতে পারে।

গ্যালাকটিক নেভিগেটর: গুবরে পোকা (Dung beetle)

পৃথিবীর খুদে এক জ্যোতির্বিজ্ঞানী হলো গুবরে পোকা (Dung Beetle)। অবাক করার মতো বিষয় হলো, রাতের অন্ধকারে পথ চলার জন্য তারা আস্ত ছায়াপথ (Milky Way) ব্যবহার করে!
কিভাবে তারা পথ চিনে নেয়? গুবরে পোকারা যখন তাদের খাবারের বল নিয়ে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যায়, তখন তারা আকাশের তারার ঝিলিক দেখে দিক ঠিক রাখে। প্রকৃতি আসলেই অনেক অদ্ভুত।

প্রকৃতির ডেডপুল: তেলাপোকা

কমিক বইয়ের সুপারহিরো ডেডপুলকে চেনো? তার সবচেয়ে বড় ক্ষমতা হলো 'হিলিং ফ্যাক্টর'—শরীর যতোই জখম হোক, সে আবার ঠিক হয়ে যায়। এমনকি মাথা কেটে ফেললেও সে মরে না! আমাদের ঘরের কোণে থাকা সাধারণ তেলাপোকা ঠিক এরকম কিছু ক্ষমতারই অধিকারী।
তেলাপোকা বাস্তবের ডেডপুল কারণ— সে মাথা ছাড়াও সপ্তাহখানেক বেঁচে থাকতে পারে! শুধু তাই নয় আজ যদি বাংলাদেশে পারমাণবিক বিস্ফোরণ ঘটে, তাহলে তুমি আমি মারা গেলেও আমাদের ঘরের কোণের তেলাপোকার কিছুই হবে না! কারণ তেলাপোকা উচ্চমাত্রার বিকিরণ সহ্য করতে পারে

প্রকৃতির খুদে হাল্ক: জাম্পিং চ্যাম্পিয়ন ফ্রগহপার! (Froghopper)

মার্ভেলের সবুজ দানব সুপারহিরো 'হাল্ক'-এর কথা মনে আছে? রেগে গেলে সে কী বিশাল লম্বা লাফ দেয়, তাই না? পোকামাকড়ের জগতেও এমন একজন আছে, যে তার আকারের তুলনায় অবিশ্বাস্য লাফ দিতে পারে। নাম তার ফ্রগহপার (Froghopper)!
লাফ দেওয়ার সময় সে তার ওজনের ৪০০ গুণ (400 Gs) বল অনুভব করে । এটা এতটাই শক্তিশালী যে মহাকাশে যাওয়ার সময় বিশাল রকেটের ভেতরে অ্যাস্ট্রোনাটরা (মহাকাশচারীরা) মাত্র ৯ গুণ (9 Gs) এই জ্ঞান হারিয়ে ফেলে! ফ্রগহপার সেখানে ৪০০ গুণ চাপ সহ্য করে নিমেষে আকাশে উধাও হয়ে যায়।
এই ছোট্ট পোকাটা যদি মানুষের আকারের হতো তাহলে তার এই ক্ষমতা ব্যবহার করে এক লাফেই কয়েকশতলা বিল্ডিং পার হয়ে যেতো!

পরেরবার তুমি যদি ঘাসের উপরে কোনো গুবরে পোকা, পুকুরের ওপরে ফড়িং উড়তে দেখো বা তোমার ঘরের মধ্যে কোনো তেলাপোকা দেখো তাহলে ভেবে নিবে তুমি কোনো, রক্তমাংসের সুপারহিরোকেই দেখছো।

মোঃ মাহবুবুর রহমান
কৃষি অনুষদ
ব্যাচ: ২৩
শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়

শেষ অ্যান্টিবায়োটিক

সাল ২১২৬

মানবজাতি জিতে গেছে দুরারোগ্য সব রোগের বিরুদ্ধে, জিনগত রোগ প্রায় নেই।
কিন্তু হেরে গেছে এক শত্রুর কাছে-
এন্টিবায়োটিক রেজিস্টেন্ট ব্যাকটেরিয়া!

একসময়ের সাধারণ ইনফেকশন এখন মারাত্মক। পৃথিবীর প্রায় সব অ্যান্টিবায়োটিকই অকেজো। এই প্রলয়ের মধ্যে বেঁচে থাকা কয়েকটি জীবনের একটি হলো- ইংল্যান্ড বংশোদ্ভূত বাংলাদেশের তরুণ মাইক্রোবায়োলজিস্ট এবং মেডিসিন বিশেষজ্ঞ **ডা. জন ওয়াটসন**।

একদিন ল্যাবে আনা হয় একটি ১২ বছরের বালক। নাম তার অ্যাডাম। জন্মেছিলো আমেরিকার ফ্লোরিডাতে। তার শরীরে এমন এক সংক্রমণ, যা অন্য সব রোগীর থেকেও ভয়ংকর।

পরীক্ষায় দেখা যায়-
- ব্যাকটেরিয়ার কোষ-দেয়াল নেই
- অ্যান্টিবায়োটিক লাগলে সে "মরার" বদলে নতুন রূপ নেয়
- প্রতিবার আক্রমণের পর আরও শক্তিশালী হয়
- কোষ ভাগ হয় আলো গতির কাছাকাছি দ্রুততায়

ওয়াটসন প্রথমে ভাবল, "এটা কি মিউটেশন?" কিন্তু পরে জানতে পারে যে, এটি মানুষের তৈরি **"স্মার্ট ব্যাকটেরিয়া"**, যা ২০৬০-এর গোপন বায়ো-ওয়ার প্রজেক্টে বানানো হয়েছিল, যাতে পরবর্তীতে মানবজাতিকে টিকে রাখতে সাহায্য করবে।

একটি মারাত্মক সত্য সামনে আসে- ব্যাকটেরিয়াটি আসলে নিজেই **অ্যান্টিবায়োটিক শোষণ করে জিনগতভাবে আপগ্রেড হয়**।

ওয়াটসন ছেলেটির রক্ত বিশ্লেষণ করতে গিয়ে একটি অসম্ভব ব্যাপার খুঁজে পায়।

অ্যাডামের শরীরে আছে এক **অদ্ভুত ইমিউন সিগন্যাল**, যা ব্যাকটেরিয়ার জিন পরিবর্তনের গতিকে সাময়িকভাবে ধীর করে দেয়।

এটি পৃথিবীর শেষ সম্ভাব্য প্রতিরোধ।

ওয়াটসন বুঝতে পারে-
ছেলেটি বাঁচলে, পুরো মানবজাতি বাঁচবে। কিন্তু ব্যাকটেরিয়াটি এত দ্রুত পরিবর্তিত হচ্ছে যে সময় খুব কম।

ওয়াটসন সিদ্ধান্ত নেয়-
ব্যাকটেরিয়ার জিনোম ভেঙে দেওয়ার জন্য অ্যাডামের ইমিউন সিগন্যালকে "মলিকুলার অ্যামপ্লিফায়ার" মাধ্যমে শক্তিশালী করবে।

এই প্রযুক্তি পরীক্ষামূলক। ব্যর্থ হলে-
- অ্যাডাম মারা যাবে
- ব্যাকটেরিয়া আরও শক্তিশালী হয়ে বিশ্বে ছড়িয়ে পড়বে
- মানবজাতি নিশ্চিহ্ন হবে

ওয়াটসন মেশিন চালু করতেই-
ব্যাকটেরিয়াটি অ্যাডামের শরীরে নতুন রূপ নেয়। এবার সে মানুষের স্নায়ুকোষের মতো সংকেত পাঠাতে শুরু করে!
মনে হলো-
এটি কেবল ব্যাকটেরিয়া নয়; একটি শিখতে পারা বুদ্ধিমান জীব।

মেশিনের আলো জ্বলে উঠতেই ব্যাকটেরিয়াটি ওয়াটসনের দিকে তাকিয়েছে যেন। মাইক্রোস্কোপের স্ক্রিনে দেখা যায়-
ব্যাকটেরিয়া ওয়াটসনের দেহ "Mimic" করে তার ইমিউন সিস্টেমে আক্রমণের প্যাটার্ন শিখে ফেলছে।

এটি এখন মানুষের চিন্তাও অনুকরণ করতে পারে।

ঠিক তখনই অ্যাডামের হৃদস্পন্দন থেমে যেতে থাকে। ওয়াটসন তাকে বলতে থাকে-
"না! তুমি একা নও, লড়াই করো!"
এবং সেই সাথে মেশিনের চূড়ান্ত পালস দেওয়া হয়।

হাত রেখে দাঁড়ানোর চেষ্টা করতেই সে লক্ষ্য করল- মেঝেতে তার নিজের ছায়া কাঁপছে...হাত রেখে দাঁড়ানোর চেষ্টা করতেই সে লক্ষ্য করল- মেঝেতে তার নিজের ছায়া কাঁপছে...যেন কারও সঙ্গে তাল মিলিয়ে নড়ছে।
অ্যাডাম হঠাৎ উঠে বসল। তার চোখে অদ্ভুত এক দীপ্তি।
"ডাক্তার... আপনি কি ভাবছেন যে আপনি সংক্রমিত? হ্যা.. ঠিকই ভাবছেন। কিন্তু ব্যাপারটা আরও বড়।"

ওয়াটসন বিস্ময়ে তাকিয়ে রইল। অ্যাডাম বলল-
"ব্যাকটেরিয়া শুধু আপনার স্নায়ুতে ঢোকেনি...
আপনার পুরো ইমিউন প্যাটার্ন কপি করেছে।
ঠিক যেমনটা সে আমার ক্ষেত্রে করেছিল। এখন আমরা... সংযুক্ত।"

ওয়াটসন কাঁপা গলায় বলল-
"সংযুক্ত... মানে?"

অ্যাডাম ঠোঁটে অদ্ভুত হাসি ফুটিয়ে বলল-
"মানে... আপনি যখন মানুষের শেষ রক্ষক হিসেবে ব্যাকটেরিয়াকে হারালেন, ব্যাকটেরিয়াটি মানুষের রক্ষককে বেছে নিল তার নতুন সত্তা হিসেবে।"

হঠাৎ ল্যাবের আলো নিভে গেল।
শুধু স্ক্রিনে একটি নতুন বার্তা জ্বলে উঠল-
"Adaptive Host Identified."

অল্প আলোতে ওয়াটসন দেখল-
অ্যাডামের চোখের মণি বদলে যাচ্ছে। তার দৃষ্টি এখন আর বাচ্চার মতো নয়, বরং হাজারো শিখে ফেলা তথ্যের অদ্ভুত ভার।

অ্যাডাম ধীরে বলল-
"ড. ওয়াটসন... আপনি মানবজাতিকে বাঁচিয়েছেন, এখন মানবজাতিকে গড়ার পালা। আর আমি... আমি প্রথম ধাপ।"

ওয়াটসন পিছিয়ে যেতে থাকে। তার মাথার ভেতর কারও ফিসফিসানি-
"We are one now..."

আলো আবার জ্বলে উঠল। অ্যাডামের মুখে এখন সম্পূর্ণ ভিন্ন এক অস্তিত্বের শান্ত হাসি। এবার সে বলল-
"ডাক্তার... আপনার ভয় আমি শুধু শুনিনি...
এখন আমি তা নিয়ন্ত্রণ করতে পারি।"

ওয়াটসন দৌড়াতে চাইল। কিন্তু ঠিক তখনই তার নিজের হাত নিজেই থেমে গেল। অদৃশ্য কোনো শক্তি তাকে থামিয়ে দিয়েছে। অ্যাডাম ফিসফিস করে বলল-
"শেষ অ্যান্টিবায়োটিকের যুগ শেষ...
এখন শুরু হচ্ছে New Host Era"

ওয়াটসনের কানে পরিচিত শব্দটা আবারও বাজল-
"We are one."

এবার সে বুঝল ব্যাকটেরিয়া ধ্বংস হয়নি। শুধু রূপ বদলেছে।
আর তার নতুন রূপ...মানুষের ভেতরে।

মো. নাজমুল হাসান
এমবিবিএস ৪র্থ বর্ষ
কুমিল্লা মেডিকেল কলেজ

চোখের বিদ্রোহ

এটা আমাদের সাথে ঘটে যাওয়া নিত্য দিনের ঘটনা, দেখা গেল আপনি অনেক মনোযোগ সহকারে একটা বিষয় নিয়ে পড়ছেন। হঠাৎ !!! হঠাৎ আপনার চোখের পাতা নিজের ইচ্ছাই বন্ধ হয়ে আসছে। তারা আপনার সাথে বিদ্রোহ ঘোষণা করে বলছে " আজ আর না, এখন ঘুম চাই"।
এখন দেখি এই ঘুমের পিছনের আসল রহস্য নিয়ে "বিজ্ঞান" সাহেব কি বলে,
ঘুম ঘুম অনুভূতি বা তন্দ্রা আসলে আমাদের শরীরের একটি সূক্ষ্ম ও সুসংগঠিত শারীরবৃত্তীয় সংকেত। এটি জানিয়ে দেয় যে শরীর ও মস্তিষ্ক এবার বিশ্রাম চাইছে, যাতে তারা পুনরায় কার্যক্ষম হয়ে উঠতে পারে।
এই প্রক্রিয়ার পেছনে অন্যতম প্রধান কারণ হলো "অ্যাডেনোসিন" (Adenosin) নামক নিউরো কেমিক্যাল। আমরা যত বেশি সময় জেগে থাকি, অ্যাডেনোসিন ততই আমাদের মস্তিষ্কে জমা হতে থাকে।
এটা স্নায়বিক কার্যকলাপকে ধীর করে দেয় এবং আমাদের মধ্যে তন্দ্রাভাব সৃষ্টি করে। তাই দীর্ঘ সময় জেগে থাকার পর হঠাৎ-ই মনে হয়- "এবার আর না, ঘুমাতেই হবে।"
এর পাশাপাশি কাজ করে আমাদের দেহের অভ্যন্তরীণ জৈবিক ঘড়ি, যা সার্কাডিয়ান রিদম (Circadian Rhythm) নামে পরিচিত।
এটা দিন-রাতের আলোক অন্ধকার চক্রের সাথে সামঞ্জস্য রেখে আমাদের ঘুম ও জাগরণের সময় নির্ধারণ করে। সন্ধ্যা হলে মেলাটোনিন হরমোনের নিঃসরণ বৃদ্ধি পায়, যা শরীরকে ধীরে ধীরে ঘুমের দিকে নিয়ে যায়।
মজার বিষয় হলো, একঘেয়ে পরিবেশ (সবচেয়ে বড় উদাহরণ- বোরিং কোনো বিষয়ের দীর্ঘ লেকচার) ঘুম ঘুম ভাবকে আরো বাড়িয়ে তোলে।
কারণ মানুষ তখন উদীপনার মাত্রা পায় না, ফলে স্নায়ুতন্ত্র আরও শ্লথ হয়ে পড়ে।

আবার দুপুরে ভরপেট খাওয়ার পর চোখ-ভর্তি ঘুমের আগমন সাধারণ ঘটনা। কারণ তখন শরীরের রক্ত প্রবাহের একটি বড় অংশ পরিপাকতন্ত্রে কেন্দ্রীভূত হয়, ফলে মস্তিষ্ক তুলনামূলক কম সক্রিয় হয়ে পড়ে।

তবে ঘুম কেবল ক্লান্তি দূর করার জন্য নয়- এটি স্মৃতি সংরক্ষণ, কোষ মেরামত এবং মানসিক স্থিতিশীলতার জন্য অপরিহার্য। পর্যাপ্ত ঘুমের অভাবে মনোযোগ কমে যায়, শেখার ক্ষমতা হ্রাস পায় এবং শরীর দ্রুত ক্লান্ত হয়ে পড়ে।

সবশেষে বলা যায়,
"ঘুম আমাদের দুর্বলতা নয়- এটি শরীরের বুদ্ধিমত্তার সবচেয়ে নিঃশব্দ প্রকাশ।"

মুমতাহিনা তমা
কৃষি অনুষদ
ব্যাচ: ২৪
শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়

জীবন জীবনই

জীবন মানে কী? এর একেবারে নির্দিষ্ট, স্বতঃসিদ্ধ, প্রমাণিত ও সবার কাছে গ্রহণযোগ্য কোনো একক সংজ্ঞা আমার জানা নেই। তবে নিজের মতো করে এর একটা সংজ্ঞা চাইলে দেয়াই যায়। কিন্তু সে সংজ্ঞাটি দেয়ার আগে আমার ছোট্ট জীবনের এখন অব্দি জানা সেরা ও পছন্দের সংজ্ঞাটি না বললেই নয়। একাদশ শ্রেণিতে পড়াকালীন, ড. আবুল হাসান স্যারের জীববিজ্ঞান প্রথম পত্র বই এ অণুজীব অধ্যায়ের একজন অণুজীববিজ্ঞানী আন্দ্রে লফ বলেছিলেন, "ভাইরাস ভাইরাসই" (Virus is a virus)।

এখনো অব্দি পড়া অসংখ্য সংজ্ঞার মধ্যে আর সেই শান্তি পাওয়া যায় না, যা এই সংজ্ঞায় লুকায়িত। এখন আসি জীবন নামক শব্দটির সংজ্ঞার খোঁজে, এই সংজ্ঞা খুঁজতে গিয়ে দেখলাম বিভিন্ন দিক থেকে বিভিন্ন ভাবে এর সংজ্ঞা দেয়া হয়েছে,

আমাদের ইসলামে জীবন হলো,"আল্লাহ প্রদত্ত একটি পরীক্ষা।"

বায়োলজির ধারণা মতে, "জীবন হলো সেই বৈশিষ্ট্যসমূহের সমষ্টি যা জীবিত প্রাণীকে অজীব থেকে আলাদা করে।" আবার বিখ্যাত সাহিত্যকদের মতে, "জীবন একটি নাট্যমঞ্চ, যেখানে সবাই নিজের ভূমিকা পালন করে।"

এত সব সংজ্ঞার ভীড়ে, আমি আবার সুন্দর করে গুগোলেও সার্চ দিলাম, লিখলাম" জীবন মানে কি? সেখানে পেলাম, "জীবন হলো জন্ম ও মৃত্যুর মধ্যবর্তী সময়, যা সুখ-দুঃখ, সংগ্রাম, শেখা এবং অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হয়।" এটা পড়া মাত্রই হুট করে মাথায় এলো,আমার বইপ্রেমী বন্ধুটি একদিন বলেছিল, দ্যা অ্যালকেমিস্ট বইয়ের একটি লাইন, সেখানে বলা ছিল "যেখানে আছি সেখানে টিকে থাকার নামই জীবন।"

জীবন আসলেই তাই, আমি খেয়াল করে দেখলাম প্রত্যেকের দেয়া সংজ্ঞা গুলোই, আমাদের জীবনের সাথে মিলে যায়। প্রত্যেকে তার নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি থেকে যেভাবে যা উপলব্ধি করেছে সেটাকেই জীবন বলেছে। অবশেষে বুললাম জীবন কে নানা ভাবে সংজ্ঞায়িত করা যায় নানা দিক থেকে, নানা দৃষ্টিভঙ্গি থেকে। সেই ধারণা থেকেই আজ জীবন নিয়ে আমি যে সংজ্ঞাটি উপলব্ধি করলাম সেটি এই যে দুই টি অক্ষরে প্রকাশ করা যায়। আমার মতে জীবনের মানে "আপেক্ষিক"।

অর্থাৎ, জীবন পরিস্থিতি/দৃষ্টিভঙ্গির উপর নির্ভর করে।

আপেক্ষিক শব্দটি শুনলেই যে কথাটি সবার আগে মাথায় আসে তা হলো বিজ্ঞানী Albert Einstein-এর আপেক্ষিকতার তত্ত্ব। সেই তত্ত্ব কি ব্যাখ্যা করা হয়েছিল তা পুরোপুরি আমার মস্তিষ্কে জায়গা করতে না পারলেও, মোটামুটি এটুকু বুঝতে পারি পরিস্থিতির পরিবর্তনে স্থান-সময়, ভর ইত্যাদি স্থির নয়; এগুলো পরিবেশের গতি বা অবস্থার উপর নির্ভর করে পরিবর্তিত হয়। সেখান থেকেই এই আপেক্ষিক শব্দটির সঙ্গে পরিচিত হই। এই বুঝলাম না, এই ধারণার সাথেই আমি জীবনের মানে খুঁজতে খুব সহজভাবেই মিল খুঁজে পাই। কারণ আমাদের কাছে জীবনের মানে কখনোই স্থির থাকে না।

আমি যদি বস্তু নামক গতির সমুদ্রে ভাসতে ভাসতে একদিন তীরে পৌঁছাই সেই সময় আর, আজকের আমার কাছে যেমন হবে জীবনের মানে, আর যদি আজকে আমি এই গতির সমুদ্রে ডুবে যাওয়ার ভয় করি, সেই মুহূর্তে আমার মনে হবে জীবন অর্থহীন। যেহেতু পুরো দৃষ্টিভঙ্গির উপর জীবনের মান নির্ভর করে, তবে তার নাম আপেক্ষিক না হয়ে আর কি বা হতে পারে।

আমার জীবন নিয়ে যত চিন্তা ভাবনা, অসংখ্য সব ধারণা তার সমষ্টি এখানেই। তবে জীবন নিয়ে আসল যে সংজ্ঞাটি আমার মনে রয়েছে তার কথা আমি এখানে বলিনি। যদি কোনোদিন আমি অনেক বড় বিজ্ঞানী হই, সেদিন আমি জীবনের সংজ্ঞা দিবো, "জীবন জীবনই"!

হৃদিতা ইমরোজ রাত্রী
কৃষি অনুষদ
ব্যাচ: ২৩
শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়

DNAএর আদ্যপান্ত

অনেক আগেকার সময়ে, যখন মানুষের জীবন ছিল সাধারণ, ছিল না কোন জটিলতা, মানুষ তখন ধীরে ধীরে প্রকৃতিকে বুঝতে শিখছিলো। তখন মানুষের মনে প্রশ্ন আসে, ঠিক কি কারণে বা কিভাবে আমাদের জীবন নিয়ন্ত্রিত হয়? কিভাবেই বা মা-বাবার বৈশিষ্ট্য সন্তানের দেহে স্থানান্তর হয়? যার জন্য এতো কিছু হচ্ছে সেটিই হলো ডিএনএ।

১৮৬০-এর দশকে, একজন শান্ত স্বভাবের বিজ্ঞানী Gregor Mendel মটরগাছ নিয়ে পরীক্ষা করছিলেন। তিনি লক্ষ্য করলেন বাবা-মায়ের বৈশিষ্ট্য সন্তানদের মধ্যে নির্দিষ্ট নিয়মে যায়। তিনি জিনের ধারণা দিলেন, যদিও তখন কেউ বুঝতেই পারেনি এই জিন আসলে কী! সময় কেটে গেল। ১৮৬৯ সালে, আরেক বিজ্ঞানী Friedrich Miescher মানুষের কোষ থেকে এক অদ্ভুত পদার্থ আলাদা করলেন। তিনি এটাকে নাম দিলেন Nuclein। এটাই ছিল ডিএনএ-এর প্রথম আবিষ্কার, কিন্তু তখনও কেউ জানত না এটা কতটা গুরুত্বপূর্ণ। এরপর বহু বছর ধরে বিজ্ঞানীরা বিভ্রান্ত ছিলেন—জীবনের রহস্য তবে কি এই Nuclein-এর মধ্যে লুকিয়ে আছে, না অন্য কিছু এর জন্য দায়ী?

রহস্য ধীরে ধীরে গভীর হচ্ছিল। একদিন ১৯৫০-এর দশকে, বিজ্ঞানী Rosalind Franklin X-ray crystallography দিয়ে ডিএনএ-এর ছবি তুললেন । তার তোলা বিখ্যাত "Photo 51" দেখাল ডিএনএ দেখতে যেন পাকানো সিঁড়ির মতো! এই তথ্য ব্যবহার করে দুই তরুণ বিজ্ঞানী James Watson এবং Francis Crick ভাবতে লাগলেন—যদি ডিএনএ এমনভাবে গঠিত হতো যাতে এটি নিজেই নিজের কপি বানাতে পারে?
এই ভাবনা থেকে তারা একটি মডেল বানালেন এবং হঠাৎ করেই সবকিছু পরিষ্কার হয়ে গেল! ডিএনএ হলো একটি ডাবল হেলিক্স—একটি পাকানো সিঁড়ি, যার প্রতিটি ধাপে থাকে চারটি বেস: A, T, G, C। A সবসময় T-এর সাথে, G সবসময় C-এর সাথে জোড়া বাঁধে।
Watson আনন্দে চিৎকার করে উঠলেন—
"We have discovered the secret of life!"
এভাবেই আবিষ্কৃত হলো ডিএনএ-এর গঠন, উন্মোচিত হলো জীবনের নানান রহস্য, আর বদলে গেলো জীববিজ্ঞান।

এখন আসি ডিএনএ-এর নিজের আত্মকাহিনীতে।
আমি ডিএনএ। আমি প্রতিটি কোষের নিউক্লিয়াসে থাকি। আমি লম্বা, সূক্ষ্ম, কিন্তু আমার ভেতরে আছে অসীম তথ্য। আমি জানি একটি শিশু কেমন হবে, একটি গাছ কত বড় হবে। আমার শরীর গঠিত চারটি অক্ষর দিয়ে—A, T, G, C। এই অক্ষরগুলো দিয়েই আমি জীবনের ভাষা লিখি। যখন একটি কোষ বিভাজিত হয়, আমি নিজেকে খুলে ফেলি। আমার দুটি সুতো আলাদা হয়ে যায়। তারপর প্রতিটি সুতো নিজের মতো করে নতুন সঙ্গী খুঁজে নেয়। এভাবেই আমি নিজের কপি তৈরি করি একেবারে নিখুঁতভাবে। আমার ভেতরে ছোট ছোট জিন নামক অংশ আছে। এই জিনগুলোই ঠিক করে দেয় তোমার চোখ কালো না বাদামি, তুমি লম্বা না খাটো।

কিন্তু মাঝে মাঝে আমারও ভুল হতে পারে—যাকে তোমরা বলো mutation। এই mutation কখনো ঘটায় evolution, আবার কখনো ঘটায় প্রাণঘাতী রোগ। একদিন, একটি ছোট ছেলে আয়নায় নিজের মুখ দেখে ভাবছিল—
"আমি আমার বাবার মতো দেখতে কেন?"
তার অজান্তেই, আমি ডিএনএ—তার ভেতরে তার ভাবনার উত্তর নিয়ে বসে আছি।

আমি তার শরীরের প্রতিটি কোষে, প্রতিটি মুহূর্তে কাজ করছি। আমি তার অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ সব বহন করছি। আজ বিজ্ঞানীরা আমাকে শুধু বুঝেই থেমে থাকেননি, আমাকে ব্যবহারও করছেন

আমার ব্যবহার করে তারা রোগ নির্ণয় করছেন, রোগ নিরাময়ের উপায় খুঁজছেন, অপরাধীর পরিচয় বের করছেন। আরো অনেক জায়গায়, অনেকভাবে আমাকে ব্যবহার করার চেষ্টা চলছে।
তবুও, আমি এখনো রহস্যময়।
কারণ আমার ভেতরে শুধু তথ্য নেই—আছে জীবনের গল্প।

শামীম কাদির শিশির
কৃষি অনুষদ
ব্যাচ: ২৩
শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়

স্বপ্নের গন্তব্যে প্যারাসাইটোলজি

জীবন যেন এক অন্তহীন রেলপথ। আমরা প্রত্যেকে তার যাত্রী। যাত্রাপথে অসংখ্য সংগ্রাম, হিড়িক পড়ে টিকিট সংগ্রহের ধাক্কা, আর সেই দুর্লভ টিকিট যেন সোনার হরিণ—ঈদযাত্রার আনন্দময় মুহূর্তে। মাথা ভর্তি দুশ্চিন্তা, হৃদয়পূর্ণ আবেগ আর আকাশছোঁয়া স্বপ্ন নিয়েই আমরা ছুটে চলি প্রিয়জনদের সাক্ষাতে। ক্ষণিকের বিরতিতে এসে হাজির হয় পথবিক্রেতা, মুখরোচক ও রোমাঞ্চকর খাবারের সাথে। মুড়ি মাখা, ফুচকা, তেতুলের টক, পুদিনা, লেটুস ও ধনিয়া পাতা, তাজা শসা ও টমেটো—সবই যাত্রাপথকে করে তোলে আরও আনন্দের, আরও আড্ডাভরা।

কিন্তু এই আনন্দের যাত্রা সঙ্গী হয় প্যারাসাইট নামক অদৃশ্য বন্ধু-প্রতিম শত্রুর। গল্পের ছন্দে, গাছের দৌড়ানি আর বিস্তৃত সবুজ ফসলের মাঠে নিজের কল্পনার রাজ্যে হারিয়ে যাওয়ার সময়, তারা আমাদের ক্ষুদ্রান্তে বাসা বাঁধে। সংক্রমণ ক্ষমতা সম্পূর্ণ, জীবনিশক্তি শোষণ করে, বংশ বৃদ্ধির জন্য ডিম পাড়ে। প্রকৃতিও তাদেরকে যেন উপযুক্ত পরিবেশ দিয়েই আপন করে নিয়েছে। এভাবেই ট্রেন যাত্রা শুধু আনন্দ নয়—সাক্ষাৎ করায় চিকিৎসকেরও পাঠ।

ভাইভা বোর্ডে, স্যারের কাছে "সরি স্যার" বলতে বলতে মনে হয়, ডাক্তারকে কীভাবে বলব "সরি স্যার, সম্ভব নয়"? কিন্তু আমাদের প্রিয় স্ন্যাকসগুলো—মুড়ি মাখা, ফুচকা, তেতুলের টক—আমাদের ছাড়তে চায় না।

স্যার বললেন, "জীবন আগে, এসব পরে।"

আমি বললাম, "ডাক্তার স্যার, যদি এসব পরে হয়, তাহলে তো আপনার প্যারাসাইটোলজি জ্ঞানের চর্চা কীভাবে হবে?"

স্যার হেসে বললেন, "আবার আসবে, আমার এই চিকিৎসালয়ে। অবশ্যই আলবেন্ডাজলের কোর্স কমপ্লিট করে।"

সতর্কতা :

রাস্তার ধারের খোলা খাবার বা dusty street foods (মুড়িমাখা, ফুচকা) প্যারাসাইট দ্বারা সংক্রমণের সম্ভাবনা বেশি। কাঁচা শাকসবজি বা অর্ধসিদ্ধ খাবার ***Hymenolepis nana, Ascaris, Giardia***-এর মতো zoonotic parasites ছড়াতে পারে।

নিয়মিত হাত ধোয়া, ভালোভাবে ধোয়া বা রান্না করা খাবার খাওয়া সংক্রমণ প্রতিরোধে গুরুত্বপূর্ণ।

আসাদুজ্জামান নূর
কৃষি অনুষদ
ব্যাচ: ২৩
শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়

শব্দেন্দ্রিয় ও কুরআন

কখনো লক্ষ্য করেছ, ক্লাসে কোনো শিক্ষক কথা বললে ঘুম পায়, আবার কারো ক্লাস অনেক ভালো করে মনোযোগ দিয়ে কেন করতে পারো? না চাইতেই ঘুম আসে কেন?

আমাদের মস্তিষ্ক মেইনলি ৫ ধরণের ব্রেইন ওয়েভ নিয়ে ডিল করে। আলফা, বিটা, গামা, ডেল্টা, থিটা। এর মধ্যে সিগমা নাই কেন? তা আবার জিজ্ঞেস করো না যেন। এটা মেইনলি আমরা যে পাওয়ার ন্যাপ নেই সেক্ষেত্রে কাজ করে। তবে তার গল্প আরেকদিন হবে। আপাতত এই ৫ ওয়েভে ফিরে আসি। আলফা তোমাকে রিলাক্স করতে সাহায্য করে, বিটা ফোকাস বাড়ায়, গামা দ্রুত চিন্তায় সাহায্য করে; অনেকটা তুমি পার্ট বাই পার্ট পড়া বুঝলে সেটা বিটার ক্রেডিট, তবে সম্পূর্ণ পড়া একসাথে মাথায় ক্লিক করলে সেটা গামার ক্রেডিট। থিটা হল হালকা ঘুম ঘুম অবস্থা তৈরি করে।

এখন, যদি কোনো শিক্ষক একটা বোরিং ক্লাস নেয়, এবং তার সাথে আস্তে আস্তে কথা বলে, মস্তিষ্কে আলফা বা বিটা ওয়েভ চলে যায় থিটা ওয়েভে। এর সাথে আছে শিক্ষার্থীদের সাথে কোনো কানেকশন তৈরি না করা, এতে করে বোরিং লেকচার না শোনার জন্য মেন্টালি ব্রেইন নিজেকে প্রিপেয়ার করে, যার কারণে আরো তুমি কথা বুঝতে পারো না। এটা কাটানোর জন্য সবচেয়ে ভালো টনিক হল ক্লাসের একঘেয়ে ধারাবাহিকতাকে ডিস্টার্ব করা। নিশ্চয়ই দেখেছ, কেউ ঘুমালে তাকে যখন সরাসরি প্রশ্ন করা হয় এরপর থেকে তার ঘুম একটু হলেও কমে যায়।

এবারে আসি এর সাথে কুরআনের কি সম্পর্ক। কুরআন তিলাওয়াত ব্রেইনকে আলফা ওয়েভ সরবরাহ করে। এটা হার্ট রেট কমায়, স্ট্রেস হরমোন কমায়, মনকে শান্ত করে।

বর্তমানে অনেক জায়গাতেই মিউজিক থেরাপি চালু আছে, সেখানে কি রক মিউজিক বাজাতে শুনেছ কেউ? (উল্টো হার্ট এটাক হতে পারে!) সেক্ষেত্রে কুরআন তিলাওয়াত চালু করলেও সাউন্ড থেরাপির মতোই কাজ করবে, কিংবা তারচেয়েও ভালো কাজ করবে।

সাউন্ড থেরাপির অনেক কিছুই এখনো গবেষণাধীন। এই থেরাপির ভবিষ্যৎ এখনো অজানা। তবে কুরআন যে আশ শিফা, তা তো আমাদের অজানা নয়। সেক্ষেত্রে এমনও হতে পারে যে দুরারোগ্য রোগ কেবল নির্দিষ্ট একটা আয়াত নির্দিষ্ট ওয়েভে বললে তার রোগ সেরে যাচ্ছে! এটা সম্ভব কি অসম্ভব তা বের করার জন্য গবেষণার বিকল্প নেই।

হাসনাত আব্দুল্লাহ
কৃষি অনুষদ
শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়

নদী পুনর্জীবনের কল্পনা

সামনে ছোট্ট নদী আর তার ধার ঘেঁষে সবুজে ঘেরা বিশাল প্রান্তর; গুড়িগুড়ি বৃষ্টির মাঝে মৃদু বাতাসে ধান গাছগুলো যেন ঝুম নৃত্য করছে। বর্ষামেদুর বিকেলে নানাবাড়ির বারান্দায় বসেছে রুহান আর তার খালাতো ভাই-বোনদের ঝালমুড়ির আড্ডা। এ মনোমুগ্ধকর দৃশ্য উপভোগ করতে করতে রুহান কি যেন ভাবছে। তাকে এমন ভাবনায় ডুবে থাকতে দেখে তুবা বলল, "বৃষ্টির সময় পরিবেশটা বেশ শান্ত-শীতল লাগছে। আচ্ছা বল তো, মেঘ থেকে বৃষ্টি হয় কী করে?"

রুহান ক্লাস ৯-এর অর্ধবার্ষিক পরীক্ষা ঈদের আগেই দিয়েছে। মেঘ থেকে বৃষ্টির প্রক্রিয়া তার জানা, এ তো ক্লাস ৪-এই সে পড়েছিল। কিন্তু ছুটিতে পড়াশোনা তার ভালো লাগে না, তার আগ্রহ সবসময় নতুন কিছু জানার। তাই সে বলল, "এসব জিজ্ঞেস করো না তো। এর চেয়ে ইন্টারেস্টিং কিছু বলো।"

তুবা - "তুই বল, কী ভাবছিলি কিছু আগে?"

রুহান তার সেই ভাবনার বিষয়টি এবার বলল, "আচ্ছা আপু, এই দেখো নদীটা কত সুন্দর, কত স্বচ্ছ আর পরিষ্কার। অথচ আমাদের বাসার পাশের বুড়িগঙ্গা নদীটা ময়লার আস্তানা হয়ে গেছে। দূষণের কারণে পানির রঙ এখন কালো। এসব নিয়ে কি কেউ কিছু ভাবে না? দূষণ থেকে বাঁচার কোনো উপায়ই কি নেই?"

এ কথা শুনে সাদিক বলল, "বেশ ভালো একটা টপিক তুলেছিস। আজকে তাহলে এ বিষয়েই আলোচনা করা যাক।"

শুরু হলো গুরুগম্ভীর আলোচনা। ৫ জনের মধ্যে রুহান সবার ছোট, বাকি সবাই বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ে । তুবা কৃষিতে, তানবীর বায়োটেকনোলজি, সাদিক পরিবেশবিজ্ঞান আর মারুফ সমুদ্রবিজ্ঞানে পড়ছে।

সাদিক বলল, "বুড়িগঙ্গার মতো নদীগুলোর এমন করুণ অবস্থার জন্য দায়ী বিভিন্ন প্লাস্টিক, কল-কারখানার রাসায়নিক ও জৈব বর্জ্য। এগুলো পানিকে দূষিত আর বিষাক্ত করে তোলে। এর ফলে পানি পান করা গবাদিপশু, পানিতে থাকা মাছসহ অন্যান্য জীব, এমনকি মানুষের মারাত্মক ক্ষতি হচ্ছে।"

মারুফ বলল, "হ্যাঁ ভাইয়া। আর এ কারণেই নদীর অনেক প্রজাতির জীব আজ বিলুপ্তির পথে।"

তানবীর বলল, "এমন দূষণ কমানো সম্ভব, যদি কোনোভাবে প্লাস্টিককে ভেঙে পচনযোগ্য করা যায় আর রাসায়নিক বর্জ্যকে পানি থেকে ছেঁকে আলাদা করা যায়।"

এসব আলোচনা শুনতে শুনতে রুহানের চোখের পাতা ভারী হয়ে আসতে থাকে। হঠাৎ সে নিজেকে আবিষ্কার করল ভিন্ন পরিবেশে; সবার গায়ে সাদা এপ্রোন, হাতে গ্লাভস আর চোখে বড় বড় চশমা। বড় এক ল্যাবে গবেষণায় ব্যস্ত তার ৪ ভাই-বোন। তুবা আর তানবীর একপাশে ***E. coli*** ব্যাকটেরিয়ার কলোনি নিয়ে কী যেন করছে, অন্য পাশে দূষিত পানি নিয়ে কাজ করছে সাদিক আর মারুফ। একপর্যায়ে তারা ব্যাকটেরিয়া আর দূষিত পানিকে একত্রিত করে। কিছুক্ষণ পরই কম্পিউটার স্ক্রিনে ভেসে উঠল— "Success"

তারা খুশিতে আত্মহারা হয়ে গেল। "আলহামদুলিল্লাহ, আমরা পেরেছি!"
রুহান জিজ্ঞেস করল, "কি পেয়েছো তোমরা?"

তারা বলল, "নদীর পানি দূষণমুক্ত করার উপায় আবিষ্কার করেছি আমরা। এর নাম 'HydroVita X'। এটি একটি জীবন্ত পরিশোধন নেটওয়ার্ক। জেনেটিক্যালি মডিফায়েড ব্যাকটেরিয়া, প্লাস্টিক ডিগ্রেডিং এনজাইম (PETase)-এর শক্তিশালী সংস্করণ এবং বায়ো ন্যানো ফিল্টারের সমন্বয়ে এটি তৈরি। দূষিত পানিতে ছড়িয়ে দিলে এটি প্লাস্টিক বা এ জাতীয় পদার্থকে ভেঙে পচনযোগ্য করে, রাসায়নিক বর্জ্য আর বিষকে নিষ্ক্রিয় করে এবং জৈব বর্জ্যকে জৈব সারে পরিণত করে। এর ফলে পানি আবার স্বাভাবিক হয়ে যায়। আর জৈব সারের

কারণে মাটির উর্বরতা বৃদ্ধি পায়।"

এরপর তারা সরকারের অনুমোদন নিয়ে বুড়িগঙ্গার পানিতে HydroVita X প্রয়োগ করে। কিন্তু তিন দিনেও লক্ষণীয় পরিবর্তন না দেখে কেউ কেউ হতাশ হয়ে যায়। মারুফ তাদের সাহস দিয়ে বলে, "নিরাশ হওয়ার কিছু নেই। কারণ, বড় পরিসরে এর কার্যকারিতা দেখাতে সময় লাগতে পারে।"

তার কথা সত্যি হলো। ৭ দিনের মধ্যেই নদীর পানি কালো থেকে সবুজ আর সবুজ থেকে ধীরে ধীরে স্বচ্ছ হয়ে গেল। তাদের এ সাফল্যের খবর মিডিয়ার মাধ্যমে সারা দুনিয়ায় ছড়িয়ে পড়ল।

বিজ্ঞানভিত্তিক জার্নালগুলোতে তাদের এই গবেষণা ছাপানো হচ্ছে। দেশ-বিদেশে বিভিন্ন সেমিনারে তাদের ডাক পড়ছে। কিন্তু রুহানের নাম ধরে কে এত ডাকছে? সে চোখ মেলে ধীরে ধীরে উঠে বসল । তাহলে এসব স্বপ্ন ছিল? আসলে সে হঠাৎ ঘুমিয়ে পড়েছিল, সাদিক তাকে ডেকে তুলল। রুহান বিস্ময় নিয়ে বলল, "জানো, আমি একটা বিজ্ঞানভিত্তিক স্বপ্ন দেখেছি!" মারুফ হাসতে হাসতে বলল, "স্বপ্ন আবার বিজ্ঞানভিত্তিক হয় কীভাবে!"

রুহান পুরো স্বপ্নটা বলল তাদের। সব শুনে তানবীর বলল, "আইডিয়াটা কিন্তু দারুণ। এটা নিয়ে গবেষণার অনেক সুযোগ আছে।"

তুবা বলল, "সত্যিই যদি দূষিত পানি পরিশোধিত হয়ে জৈব সার উৎপাদন করা যায়, তাহলে রাসায়নিক সারের নির্ভরশীলতা কমে যাবে। ফলে ফসলে কৃত্রিম রাসায়নিক সারের ক্ষতিকর প্রভাব কমবে। আর ফসল উৎপাদন খরচও কম হবে, সাথে ফসলের দামও কমবে।"

এর মাঝেই বাড়ির ভেতর থেকে তাদের ডাক পড়ল । সবাই একসাথে ঘরের দিকে যেতে থাকে।

তানবীর রুহানের কাঁধে হাত রেখে বলল, “কি ভাবছিস?”

রুহান হালকা হেসে জবাব দিল, “জানো, আমি এখন জেগে জেগে স্বপ্ন দেখছি। আমি বন্ধুদের নিয়ে একটা সংগঠন গড়ব, যারা দূষণবিরোধী সচেতনতা নিয়ে কাজ করবে। আর বড় হয়ে আমি HydroVita X -এর মতো কিছু বানাবো।”

তানবীর মুচকি হেসে বলল, “খুব ভালো ভেবেছিস ভাইয়া। স্বপ্নই তো দেখতে হবে। স্বপ্ন থেকেই পরিকল্পনা আসে, আবার তা বাস্তবায়নের পথও পাওয়া যায়। তোদের মতো স্বপ্নবাজ তরুণই তো আমাদের দেশের আজ প্রয়োজন...!”

তানিয়া নাজনিন রিফা
কৃষি অনুষদ
ব্যাচ: ২৪
শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়

বিজ্ঞানের আশ্চর্যময় অজানা তথ্য

বিজ্ঞান আমাদের শেখায়, সাধারণ মনে হওয়া জিনিসের মধ্যেও লুকিয়ে আছে অসাধারণ রহস্য।"

১. অক্টোপাসের ৩টা হার্ট!

একটা নয়, তিনটা হার্ট।

দুটো গিলের জন্য, একটা শরীরের জন্য কাজ করে । আবার সাঁতার কাটলে একটা হার্ট বন্ধও হয়ে যায়!

২. তুমি প্রতিদিন "পুরনো" মানুষ হয়ে যাচ্ছো...

শরীরের অনেক কোষ নিয়মিত মরে যায় ও নতুন কোষ তৈরি হয়—কয়েক বছর পর তোমার শরীর পুরোটাই নতুন কোষ দিয়ে প্রতিস্থাপিত হয়।তখন এক "নতুন" তুমি!

৩. মৌমাছি মানুষের মুখ চিনতে পারে...

অনেকেই জানে না—মৌমাছি আলাদা আলাদা মানুষের মুখ চিনে রাখতে পারে।

৪. ডিএনএ যদি খুলে লম্বা করা হয়...

একজন মানুষের শরীরের সব DNA একসাথে জোড়া দিলে সূর্য পর্যন্ত গিয়ে আবার ফিরে আসতে পারবে

৫. কলা কিন্তু সামান্য "radioactive"

শুনতে ভয়ংকর লাগলেও সত্যি—কলায় potassium থাকে, যার মধ্যে অল্প radioactive isotope আছে। তবে খাওয়ার জন্য একদমই নিরাপদ

৬. আগুন আসলে "জ্বলে না", আলো দেয়...

আগুনে যে আলো দেখি, সেটা আসলে উত্তপ্ত কণার glow—মানে আগুন নিজে আলাদা কিছু না, এটা একধরনের chemical reaction.

৭. মহাকাশে গন্ধ কেমন?

Astronaut রা বলেন, মহাকাশের গন্ধটা নাকি পোড়া ধাতু বা গরম লোহার মতো!

৮. তুমি প্রতিদিন একটু "লম্বা" হও...

ঘুমানোর সময় মেরুদণ্ড relax করে, তাই সকালে তুমি একটু বেশি লম্বা থাকো—দিনের শেষে আবার আগের মতো হয়ে যাও।

৯. তোমার শরীর নিজেই "স্টারডাস্ট"

আমাদের শরীরের কার্বন, অক্সিজেন—এসব উপাদান এসেছে পুরনো তারার বিস্ফোরণ (supernova) থেকে!

১০. তুমি কখনো "বর্তমান" দেখো না...

তুমি যা দেখো, সেটা আসলে একটু আগের ঘটনা—কারণ আলো আসতে সময় লাগে (যদিও খুবই অল্প)।

১১. তোমার মস্তিষ্ক "ফাঁকি দেয়"

Brain সবকিছু পুরো দেখে না—অনেক সময় নিজে নিজে missing অংশ পূরণ করে নেয় (optical illusion এর মতো)।

১২. বজ্রপাত সূর্যের থেকেও বেশি গরম...

Lightning strike এর তাপমাত্রা সূর্যের surface-এর থেকেও বেশি হতে পারে!

১৩. তুমি যে বাতাস ছাড়ো, সেটা আবার কেউ না কেউ নেয়

পৃথিবীর বাতাস continuously recycle হয়—তোমার নিঃশ্বাসের molecule হয়তো হাজার বছর আগে অন্য কেউ নিয়েছিল!

এতসব বিস্ময়কর তথ্য প্রমাণ করে, বিজ্ঞানচিন্তা শুধু বইয়ের বিষয় নয়; এটি আমাদের চারপাশের প্রতিটি জিনিসের মধ্যেই লুকিয়ে আছে।

মিথিলা সুরভী
কৃষি অনুষদ
ব্যাচ: ২৪
শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়

মাটির গন্ধে লুকানো বিজ্ঞানঃ এক বৃষ্টিভেজা উপলব্ধি

বৃষ্টি হলে আমি সবসময় একটা জিনিস খেয়াল করি—মাটির সেই বিশেষ গন্ধ। ছোটবেলা থেকেই এই গন্ধটা আমার খুব প্রিয়। কিন্তু কখনো ভেবে দেখিনি, এই গন্ধটা আসে কোথা থেকে?

একদিন বিকেলে বৃষ্টি শুরু হওয়ার সাথে সাথে আমি বারান্দায় দাঁড়িয়ে সেই গন্ধটা উপভোগ করছিলাম। হঠাৎ মনে হলো—এটা কি শুধু ভেজা মাটির গন্ধ, নাকি এর পেছনে কোনো বিজ্ঞান আছে?

কৌতূহল থেকেই খোঁজ শুরু করলাম।
পরে জানতে পারলাম, এই গন্ধের নাম "pet-richor"। এটি তৈরি হয় মূলত মাটিতে থাকা কিছু অণুজীবের কারণে, বিশেষ করে actinobacteria নামের ব্যাকটেরিয়া। এই ব্যাকটেরিয়া একটি রাসায়নিক পদার্থ তৈরি করে, যার নাম geosmin ! যখন বৃষ্টি পড়ে, তখন পানির ফোঁটা মাটিতে আঘাত করে এবং এই geosmin বাতাসে ছড়িয়ে পড়ে—আমরা তখন সেই পরিচিত গন্ধ পাই।

অর্থাৎ, যেটাকে আমরা "মাটির গন্ধ" বলি, সেটা আসলে জীবন্ত অণুজীবের তৈরি এক ধরনের রাসায়নিক সংকেত!

এখানেই শেষ নয়। এই অণুজীবগুলো মাটির উর্বরতা বজায় রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। তারা জৈব পদার্থ ভেঙে পুষ্টি উপাদান তৈরি করে, যা গাছপালা সহজে গ্রহণ করতে পারে। অর্থাৎ, কৃষির দিক থেকেও এদের গুরুত্ব অপরিসীম—যা একজন agriculture student হিসেবে আমাকে আরও বেশি আগ্রহী করে তুলেছে।

সেদিনের সেই ছোট্ট মুহূর্তটা আমার চিন্তাধারাই বদলে দিয়েছে। আগে যেখানে বৃষ্টির গন্ধ শুধু "ভালো লাগা" ছিল, এখন সেখানে আমি দেখি এক জটিল মাইক্রোবায়োলজিক্যাল প্রক্রিয়া।

এই অভিজ্ঞতা আমাকে শিখিয়েছে—প্রকৃতির প্রতিটি অনুভূতির পেছনেই আছে বিজ্ঞান। আমরা শুধু অনুভব করি, কিন্তু বিজ্ঞান আমাদের শেখায় "কেন"।

আজও যখন বৃষ্টি নামে, আমি শুধু গন্ধটা উপভোগ করি না—আমি মনে মনে সেই অদৃশ্য অণুজীবগুলোর কাজকেও কল্পনা করি।

বিজ্ঞান তখন আর বইয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না, সেটা হয়ে ওঠে জীবনের অংশ।

মৌমিতা সরকার উপমা
কৃষি অনুষদ
ব্যাচ: ২৪
শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়

পাতার ভেতরের গোপন জগৎঃ এক ছোট্ট অভিজ্ঞতা, বড় উপলব্ধি

একদিন বিকেলে পড়ার ফাঁকে আমি আমাদের বাড়ির পাশের গাছগুলোর দিকে তাকিয়ে ছিলাম। হালকা বাতাসে দুলতে থাকা সবুজ পাতাগুলোকে তখন খুব সাধারণই মনে হচ্ছিল। কিন্তু হঠাৎ মনে হলো—এই পাতাগুলোর ভেতরে আসলে কী চলছে? সত্যিই কি এরা শুধু সবুজ, নাকি এর ভেতরে লুকিয়ে আছে এক জটিল, সক্রিয় জগৎ?

এই প্রশ্নটাই আমাকে নতুনভাবে ভাবতে শিখিয়েছে। আমি তখন আমার বায়োলজি বইয়ে পড়ছিলাম photosynthesis বা সালোকসংশ্লেষ নিয়ে। সহজভাবে বললে, উদ্ভিদ সূর্যালোক, পানি ও কার্বন ডাই-অক্সাইড ব্যবহার করে নিজেদের খাদ্য তৈরি করে। কিন্তু বিষয়টা শুধু "খাদ্য তৈরি" নয়—এটা আসলে পৃথিবীর জীবনের মূল ভিত্তি।

একদিন কৌতূহলবশত আমি একটা পাতা তুলে সূক্ষ্মভাবে লক্ষ্য করলাম। চোখে দেখা না গেলেও, সেই পাতার ভেতরে অসংখ্য ক্ষুদ্র কোষ কাজ করছে। প্রতিটি কোষে রয়েছে ক্লোরোপ্লাস্ট, যেখানে থাকে chlorophyll—যা সূর্যের আলো শোষণ করে। এই আলো শক্তিকে রাসায়নিক শক্তিতে রূপান্তর করে গ্লুকোজ তৈরি করা হয়। এই প্রক্রিয়ার উপজাত হিসেবে উৎপন্ন হয় অক্সিজেন—যা আমরা প্রতিদিন শ্বাস নিতে ব্যবহার করি।

আমার কাছে সবচেয়ে অবাক করার বিষয় ছিল—একটা ছোট্ট পাতা নিঃশব্দে আমাদের জীবনের জন্য কত বড় ভূমিকা রাখছে!

এরপর আমি আরেকটা বিষয় লক্ষ্য করলাম। পাতার নিচের দিকে ছোট ছোট ছিদ্র থাকে, যাকে বলে stomata। এগুলোর মাধ্যমে গ্যাসের আদান-প্রদান হয়—কার্বন ডাই-অক্সাইড ঢুকে, অক্সিজেন বের হয়। অর্থাৎ, প্রতিটি পাতা যেন একেকটা ক্ষুদ্র "শ্বাসযন্ত্র"।

এই অভিজ্ঞতা আমাকে বুঝিয়েছে, প্রকৃতির প্রতিটি জিনিসের পেছনে আছে গভীর বিজ্ঞান। আগে যেখানে আমি শুধু একটা পাতা দেখতাম, এখন সেখানে আমি দেখি এক বিশাল বায়োকেমিক্যাল কারখানা।

আমার ব্যক্তিগতভাবে এই উপলব্ধিটা খুব গুরুত্বপূর্ণ ছিল। কারণ, এটা আমাকে বইয়ের বাইরে গিয়ে বাস্তব জীবনে বিজ্ঞান খুঁজে পেতে সাহায্য করেছে। আমরা প্রায়ই ভাবি বিজ্ঞান মানেই কঠিন সূত্র বা পরীক্ষাগার, কিন্তু আসলে বিজ্ঞান আমাদের চারপাশেই ছড়িয়ে আছে—একটা পাতায়, একটা ফুলে, এমনকি আমাদের প্রতিটি নিঃশ্বাসেও।

শেষ পর্যন্ত আমি বুঝেছি—বিজ্ঞান শেখার সবচেয়ে ভালো উপায় হলো প্রশ্ন করা, কৌতূহলী হওয়া এবং চারপাশকে নতুন চোখে দেখা।

একটা ছোট্ট পাতা আমাকে সেই নতুন চোখটাই দিয়েছে।

মৌমিতা সরকার উপমা
কৃষি অনুষদ
ব্যাচ: ২৪
শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়

"CRISPR: জিনের ভাষা পুনর্লিখনের সাইন্স বিজ্ঞান"

□ ভূমিকা: বিজ্ঞানের নতুন সংজ্ঞা
একসময় আমরা ভাবতাম—মানুষ তার জিনের বন্দি । জন্মের সাথে যে বৈশিষ্ট্য আসে, সেটাই তার নিয়তি । কিন্তু আধুনিক জীববিজ্ঞান সেই ধারণাকে চ্যালেঞ্জ করছে। এখন বিজ্ঞান শুধু জীবনকে বোঝে না, বরং প্রয়োজনে তাকে পুনর্গঠনও করতে পারে।
এই বিপ্লবের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে CRISPR—একটি প্রযুক্তি, যা আমাদের জিনের ভাষা "সম্পাদনা" করার ক্ষমতা দিয়েছে। এটি শুধু একটি বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার নয়, বরং মানব সভ্যতার ভবিষ্যৎ নিয়ে নতুন প্রশ্নের সূচনা।

□ CRISPR: প্রকৃতি থেকে প্রযুক্তি
CRISPR কোনো ল্যাবরেটরিতে কৃত্রিমভাবে তৈরি হয়নি—এর উৎস প্রকৃতির ভেতরেই। ব্যাকটেরিয়া ভাইরাসের আক্রমণ থেকে বাঁচতে নিজেদের DNA-তে ভাইরাসের অংশ সংরক্ষণ করে রাখে, যেন ভবিষ্যতে সেটিকে শনাক্ত করতে পারে।
এই প্রাকৃতিক প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকেই বিজ্ঞানীরা উন্নত করে CRISPR-Cas9 প্রযুক্তিতে রূপ দিয়েছেন। এখানে Cas9 প্রোটিন একটি সূক্ষ্ম কাঁচির মতো কাজ করে, আর guide RNA নির্দিষ্ট করে দেয় কোথায় কাটতে হবে।

□ কাজের প্রক্রিয়া: নিখুঁত সম্পাদনার বিজ্ঞান
CRISPR-এর শক্তি এর নির্ভুলতায়। এটি তিনটি ধাপে কাজ করে—
নির্দেশনা: guide RNA নির্দিষ্ট জিন চিহ্নিত করে
সম্পাদনা: Cas9 DNA কেটে দেয়
পুনর্গঠন: কোষ নিজেই সেই অংশটি নতুনভাবে গড়ে তোলে
এই প্রক্রিয়ায় একটি ত্রুটিপূর্ণ জিনকে কার্যত "ঠিক" করা সম্ভব হয়—যা আগে কল্পনার বাইরে ছিল।

□ সাম্প্রতিক অগ্রগতি: বাস্তবতার রূপ
সাম্প্রতিক বছরগুলোতে CRISPR গবেষণা ল্যাব থেকে বেরিয়ে বাস্তব চিকিৎসায় প্রবেশ করেছে—
জিনগত রোগ নিরাময়: Sickle Cell রোগে আক্রান্ত রোগীদের শরীরে সফলভাবে জিন সংশোধন করা হয়েছে ক্যান্সার চিকিৎসা: রোগীর ইমিউন কোষকে পরিবর্তন করে ক্যান্সারের বিরুদ্ধে আরও শক্তিশালী করা হচ্ছে।
ভাইরাস প্রতিরোধ: HIV-এর মতো ভাইরাসকে জিন স্তরে আক্রমণ করার গবেষণা চলছে।
এই অগ্রগতিগুলো প্রমাণ করে—CRISPR আর ভবিষ্যতের প্রযুক্তি নয়, এটি বর্তমানের বাস্তবতা।

□ কৃষি ও পরিবেশে প্রভাব
CRISPR শুধু চিকিৎসায় সীমাবদ্ধ নয়। এটি খাদ্য উৎপাদনেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে—
খরা ও লবণাক্ততা সহনশীল ফসল
কীটপতঙ্গ প্রতিরোধী উদ্ভিদ
পুষ্টিগুণ বৃদ্ধি করা খাদ্য
বাংলাদেশের মতো জলবায়ু-ঝুঁকিপূর্ণ দেশে এই প্রযুক্তি খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে বড় ভূমিকা রাখতে পারে।

□ নৈতিকতা: বিজ্ঞানের সীমারেখা কোথায়?
যেখানে ক্ষমতা আছে, সেখানে দায়িত্বও আছে। CRISPR নিয়ে সবচেয়ে বড় বিতর্ক হলো—
মানুষের ভ্রূণের জিন পরিবর্তন করা কি নৈতিক?
"ডিজাইনার বেবি" তৈরি হলে সমাজে বৈষম্য বাড়বে কি?
ভুল সম্পাদনা হলে তার দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব কী হবে?
এই প্রশ্নগুলোর উত্তর এখনো স্পষ্ট নয়। তাই বিজ্ঞানীদের পাশাপাশি নীতিনির্ধারকদেরও সচেতন ভূমিকা প্রয়োজন।

□ ভবিষ্যৎ: সম্ভাবনা ও সতর্কতা
CRISPR আমাদের সামনে যে সম্ভাবনা খুলে দিয়েছে তা অভূতপূর্ব—
জেনেটিক রোগ নির্মূল
ব্যক্তিভিত্তিক চিকিৎসা
এমনকি বিলুপ্ত প্রজাতি ফিরিয়ে আনার সম্ভাবনাও আলোচনায় এসেছে।
তবে এই শক্তি যেন নিয়ন্ত্রণের বাইরে না যায়—সেটাই সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ।

□ উপসংহার: মানুষ, বিজ্ঞান ও দায়িত্ব
CRISPR প্রযুক্তি আমাদের শিখিয়েছে—মানুষ শুধু প্রকৃতির অংশ নয়, সে তার নির্মাতাও হতে পারে। কিন্তু এই ক্ষমতা ব্যবহারের ক্ষেত্রে আমাদের সতর্ক

থাকতে হবে।

বিজ্ঞান যদি সম্ভাবনার দরজা খুলে দেয়, তবে নৈতিকতা সেই দরজার দিকনির্দেশনা দেয়। CRISPR-এর ভবিষ্যৎ নির্ভর করবে আমরা এই দুইয়ের মধ্যে কতটা ভারসাম্য রাখতে পারি তার ওপর।

 তথ্যসূত্র

BBC বাংলা
Wikipedia
World Health Organization
Nature
ScienceDirect
National Institutes of Health

সাদিয়া ইসলাম
কৃষি অনুষদ
ব্যাচ: ২৪
শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়

ডোপামিন ব্যবসা

ভূমিকা: আমরা কি আর এক মিনিটও নীরব থাকতে পারি না?

ধরা যাক, তুমি পড়তে বসেছ। সামনে খোলা বই, পাশে খাতা, মাথায় আছে বড় স্বপ্ন। কিন্তু তিন মিনিটও যায় না, হাত চলে যায় মোবাইলের দিকে। কোনো খুব দরকারি কারণ নেই, তবু স্ক্রিন জ্বলে ওঠে, আঙুল খুলে ফেলে একটি অ্যাপ, তারপর আরেকটি, তারপর আরেকটি। কয়েক সেকেন্ডের রিল, দু-একটি নোটিফিকেশন, সামান্য বিস্ময়, একটু হাসি, অল্প একটু ঈর্ষা, তারপর এক অদ্ভুত ক্লান্তি। টেবিলে ফিরে এসে মনে হয়, শরীর এখানে, কিন্তু মন যেন ছড়িয়ে গেছে শত ক্ষুদ্র উদ্দীপনায়।

এই দৃশ্য আজ আর ব্যতিক্রম নয়; বরং এটাই যেন আমাদের সময়ের স্বাভাবিক অভ্যাস। একসময় মানুষ একা বসে থাকতে পারত। জানালার পাশে বসে বৃষ্টি দেখত, বাসের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে নিজের কথা ভাবত, বইয়ের একটি পৃষ্ঠা পড়ে তার ভেতরে ঢুকে যেত। এখন সেই নীরবতার জায়গা দখল করে নিয়েছে স্ক্রিনের আলো। আমরা আর অপেক্ষা করি না; স্ক্রল করি। আমরা আর থামি না; ট্যাপ করি। অনেক সময় আমরা ভাবার আগেই প্রতিক্রিয়া জানাই ।

আধুনিক মানুষ এমন এক বৈপরীত্যের মধ্যে বাস করছে, যেখানে তার হাতে রয়েছে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় তথ্যভান্ডার, অথচ তার মন আগের যেকোনো সময়ের চেয়ে বেশি বিচ্ছিন্ন। সে এক ক্লিকে মহাকাশের খবর জেনে ফেলতে পারে, কিন্তু দশ মিনিট ধরে একটি লেখা মন দিয়ে পড়তে পারে না। সে শত মানুষের সঙ্গে যুক্ত, কিন্তু নিজের সঙ্গে এক মিনিট একা থাকতে অস্বস্তি বোধ করে। এই পরিবর্তন শুধু আচরণের নয়; ধীরে ধীরে এটি আমাদের মস্তিষ্কের অভ্যাস, প্রতিক্রিয়া, এমনকি মনোযোগের কাঠামোকেও বদলে দিচ্ছে।

এই রূপান্তরের কেন্দ্রে আছে একটি ক্ষুদ্র কিন্তু শক্তিশালী রাসায়নিক সংকেত "ডোপামিন"। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম, শর্ট ভিডিও, রিলস, নোটিফিকেশন এবং অ্যালগরিদম-নির্ভর কনটেন্টের জগৎ আমাদের মস্তিষ্ককে এমনভাবে প্রশিক্ষণ দিচ্ছে, যেখানে গভীর মনোযোগের চেয়ে দ্রুত উত্তেজনা বেশি আকর্ষণীয় হয়ে উঠছে। আর সেখানেই শুরু হচ্ছে বিপদ। কারণ মানুষের সবচেয়ে মূল্যবান মানসিক সম্পদগুলোর একটি মনোযোগ ,যা নীরবে ক্ষয়ে যেতে শুরু করেছে।

ডোপামিন: সুখের নয়, প্রত্যাশার রাসায়নিক

সাধারণ আলোচনায় ডোপামিনকে প্রায়ই "আনন্দের রাসায়নিক" বলা হয়। কিন্তু বিষয়টি পুরোপুরি তা নয় । বৈজ্ঞানিকভাবে ডোপামিন মূলত সম্পর্কিত প্রত্যাশা, প্রেরণা, পুরস্কারভিত্তিক শিক্ষা এবং অর্জনের সংকেতের সঙ্গে। মস্তিষ্ক যখন বুঝতে পারে, কোনো কাজের পর নতুন, আনন্দদায়ক বা লাভজনক কিছু পাওয়া যেতে পারে, তখন ডোপামিন-ব্যবস্থা সক্রিয় হয়। যেন ভেতর থেকে একটি ইঙ্গিত আসে, এখানে লাভ আছে, আবার করো।

অর্থাৎ ডোপামিন শুধু ভালো লাগার অনুভূতি তৈরি করে না; এটি আচরণকে পুনরাবৃত্তির দিকে ঠেলে দেয়। তুমি যদি কোনো পোস্ট দেওয়ার পর লাইক পাও, বা ফোন খুলতেই নতুন মেসেজ দেখো, মস্তিষ্ক সেটিকে একটি ক্ষুদ্র পুরস্কার হিসেবে ধরে রাখে। ফলে পরের বার ফোন হাতে নেওয়ার প্রবণতা আরও বাড়ে।

এখানে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, ডোপামিন নিশ্চিত পুরস্কারের চেয়ে অনিশ্চিত পুরস্কার বেশি পছন্দ করে। একটি নোটিফিকেশন ঠিক কী নিয়ে এসেছে, পরের ভিডিওটি কতটা মজার হবে, কে তোমার পোস্টে প্রতিক্রিয়া দিল, এই অজানা প্রত্যাশাই মানুষকে বারবার স্ক্রিনে ফিরিয়ে আনে। আসলে মানুষ শুধু সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ব্যবহার করে না; সে ধীরে ধীরে তার পরবর্তী ক্ষুদ্র পুরস্কারের প্রতীক্ষায় বাঁচতে শুরু করে।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের নকশা: কনটেন্ট নয়, কৌশলের আসক্তি

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের শক্তি শুধু এর কনটেন্টে নয়, এর নকশায়। এটি এমনভাবে তৈরি, যাতে ব্যবহারকারী যত বেশি সময় থাকবে, তত বেশি লাভ। তাই এখানে মানুষের মনোযোগকে ধরা, ধরে রাখা, এবং বারবার ফিরিয়ে আনার জন্য মনোবিজ্ঞান, স্নায়ুবিজ্ঞান ও আচরণ-বিশ্লেষণের সূক্ষ্ম কৌশল ব্যবহার করা হয়।

রিলস, শর্ট ভিডিও, ইনফিনিট স্ক্রল, অটোপ্লে, পুশ

নোটিফিকেশন এসব শুধু ফিচার নয়; এগুলো আচরণগত ফাঁদ। প্রতিটি ভিডিও অল্প সময়ের মধ্যে চমক, হাসি, কৌতূহল বা আবেগের ক্ষুদ্র বিস্ফোরণ ঘটাতে চায়। ফলে মস্তিষ্ক দ্রুত উত্তেজনার সঙ্গে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। দীর্ঘ, ধীর, মনোযোগনির্ভর কোনো কাজ তখন তুলনামূলকভাবে ফিকে লাগে।

আগে মানুষ কোনো কিছুর ভেতরে প্রবেশ করত যেমন: একটি বই, একটি আলাপ, একটি অভিজ্ঞতা। এখন কনটেন্ট মানুষের চোখে আঘাত করে মনোযোগ কেড়ে নিতে চায়। আগে গল্পের জন্য ধৈর্য লাগত; এখন ধৈর্য্যের জন্য গল্প হারিয়ে যাচ্ছে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম শুধু আমাদের বিভ্রান্ত করছে না; এটি আমাদের মস্তিষ্ককে ধীরে ধীরে এই শিক্ষা দিচ্ছে—"যদি কয়েক সেকেন্ডে উত্তেজনা না আসে, তবে এটাকে বাদ দাও।"

মনোযোগের সময়কাল কেন সংকুচিত হচ্ছে

মনোযোগ জন্মগতভাবে স্থির নয়; এটি চর্চানির্ভর। যেমন শরীরের পেশি অনুশীলনে শক্তিশালী হয়, তেমনি মনোযোগও ব্যবহারে গভীর হয়। কিন্তু যদি প্রতিদিনের জীবনে আমরা কেবল দ্রুত, খণ্ডিত, উচ্চ-উত্তেজনাপূর্ণ তথ্যগ্রহণে অভ্যস্ত হই, তাহলে মন দীর্ঘ সময় এক জায়গায় স্থির থাকার ক্ষমতা হারাতে শুরু করে।

আজ অনেকেই লক্ষ্য করেন, তারা একটি বই খুলে কয়েক পৃষ্ঠা পড়তে পারেন না, একটি লেকচার শুনতে গিয়ে ফোন চেক করেন, একটি কাজ করতে গিয়ে কয়েক মিনিট পরেই অন্য কিছুর দিকে চলে যান। এটি শুধু ইচ্ছাশক্তির দুর্বলতা নয়; এটি এক ধরনের প্রশিক্ষিত বিচ্ছিন্নতা। মস্তিষ্ক শিখে গেছে, স্থিরতার চেয়ে পরিবর্তন বেশি আনন্দদায়ক; গভীরতার চেয়ে নতুনত্ব বেশি জরুরি।

ফলে মানুষের মনোযোগের প্রকৃতি বদলে যাচ্ছে। সে তথ্য গ্রহণ করে দ্রুত, কিন্তু ধরে রাখতে পারে কম; দেখে বেশি, বোঝে কম; প্রতিক্রিয়া জানায় তৎক্ষণাৎ, কিন্তু বিশ্লেষণ করে সামান্য। দীর্ঘ মনোযোগের জায়গায় জন্ম নেয় খণ্ডিত মনোযোগ। আর সেই খণ্ডিত মনোযোগ জ্ঞানের বদলে তৈরি করে টুকরো-টাকরা তথ্যের ভিড়।

এটি কেবল ব্যক্তিগত সমস্যা নয়; এটি বৌদ্ধিক সংস্কৃতিরও সংকট। কারণ কোনো সভ্যতা যদি গভীরভাবে পড়া, শোনা, চিন্তা করা এবং প্রশ্ন করার ক্ষমতা হারায়, তবে সে দ্রুত প্রতিক্রিয়াশীল হতে পারে, কিন্তু সত্যিকার অর্থে প্রাজ্ঞ হতে পারে না।

শিক্ষার্থী ও তরুণ সমাজ: প্রতিভার নীরব ক্ষয়

এই পরিবর্তনের সবচেয়ে বড় মূল্য দিচ্ছে শিক্ষার্থী ও তরুণ প্রজন্ম। কারণ তাদের জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মানসিক কাজগুলো পড়া, বোঝা, মনে রাখা, বিশ্লেষণ করা, নতুন কিছু তৈরি করা, সবই নির্ভর করে দীর্ঘ মনোযোগের ওপর। অথচ তাদের দৈনন্দিন ডিজিটাল পরিবেশ কাজ করছে প্রায় উল্টো দিকে।

একজন শিক্ষার্থী পাঠ্যবই পড়তে বসে যদি প্রতি পাঁচ মিনিটে নোটিফিকেশন দেখে, তবে সে শুধু সময় নষ্ট করছে না; সে নিজের মনকে বিচ্ছিন্ন হতে প্রশিক্ষণ দিচ্ছে। একজন বিশ্ববিদ্যালয়-পড়ুয়া যখন গবেষণাপত্রের বদলে সারাদিন সংক্ষিপ্ত ভিডিও দেখে, তখন তার মস্তিষ্ক ধীরে ধীরে জটিল ভাবনার সহনশক্তি হারায়। সে দ্রুত তথ্য পেতে পারে, কিন্তু গভীর জ্ঞান অর্জন করতে পারে না।

সবচেয়ে ভয়াবহ ক্ষতি হয় অধ্যবসায়ে। জটিল গণিত, বিজ্ঞান, সাহিত্য, দর্শন বা সৃজনশীল কাজ, এসবের জন্য তাৎক্ষণিক পুরস্কার নয়, দীর্ঘ মানসিক সহনশীলতা প্রয়োজন। কিন্তু যদি মন ক্রমাগত ক্ষুদ্র ও দ্রুত পুরস্কারে অভ্যস্ত হয়ে যায়, তবে দীর্ঘমেয়াদি প্রচেষ্টা তার কাছে অসহনীয় মনে হয়।

এর সঙ্গে যুক্ত হয় আত্মদোষারোপ। অনেক তরুণ ভাবতে শুরু করে, সে অমনোযোগী, সে অযোগ্য, তার মধ্যে শৃঙ্খলা নেই। অথচ বাস্তবতা হলো, সে এমন এক প্রযুক্তিনির্ভর পরিবেশে বড় হচ্ছে, যা তার মানসিক দুর্বলতার সুযোগ নেয়। তার ব্যর্থতা সবসময় ব্যক্তিগত নয়; অনেক সময় তা একটি নকশাকৃত ব্যবস্থার ফল।

সৃজনশীলতা: উত্তেজনার ভিড়ে গভীরতার মৃত্যু

সৃজনশীলতা কখনোই শুধু তথ্যের প্রাচুর্য থেকে জন্মায় না। এর জন্য প্রয়োজন নীরবতা, একাকিত্ব, মন্থরতা, অনিশ্চয়তা এবং এমন কিছু সময়, যখন মস্তিষ্ক বাইরের উদ্দীপনা থেকে সামান্য মুক্ত থাকে। কিন্তু বর্তমান ডিজিটাল জীবনে সেই ফাঁকা জায়গাগুলো ক্রমেই উধাও হয়ে যাচ্ছে।

একসময় বাসে বসে মানুষ গল্প ভাবত, হাঁটতে হাঁটতে কবিতার লাইন পেত, একা বসে নিজের সঙ্গে কথা বলত। এখন সামান্য বিরতিও ফোনে ভরে যায় । আমরা একঘেয়েমিকে শত্রু মনে করি, অথচ একঘেয়েমিই বহু বড় চিন্তার জন্মভূমি। যখন মানুষ কোনো উদ্দীপনা ছাড়া কিছুক্ষণ থাকে, তখন মস্তিষ্ক নিজের ভেতরে কাজ শুরু করে; স্মৃতি, কল্পনা, অনুভূতি ও সৃজনশীল সংযোগ তৈরি হয়। কিন্তু আমরা যদি প্রতিটি ফাঁকা মুহূর্ত স্ক্রলে নষ্ট করি, তাহলে ভেতরের সেই ধীর সৃজনশীল প্রক্রিয়াটি সুযোগই পায় না।

এ কারণেই আজকের অনেক তরুণ তথ্যসমৃদ্ধ, কিন্তু অন্তর্দৃষ্টিহীন; মতামতপূর্ণ, কিন্তু মৌলিক নয়; ব্যস্ত, কিন্তু গভীরভাবে সৃজনশীল নয়। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম তাকে সর্বদা উত্তেজিত রাখে, কিন্তু তার চিন্তার গভীরতা বাড়ায় না। বরং অনেক সময় তা মনকে এমনভাবে ভরিয়ে রাখে যে নিজের কণ্ঠস্বরই আর শোনা যায় না।

মানসিক স্বাস্থ্যের ওপর অদৃশ্য চাপ

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের প্রভাব শুধু মনোযোগে সীমাবদ্ধ নয়; এটি মানসিক ভারসাম্যেও আঘাত হানে। কারণ এই প্ল্যাটফর্মগুলো মানুষকে শুধু উদ্দীপনা দেয় না, তুলনাও শেখায়। অন্যের সাফল্য, সৌন্দর্য, জনপ্রিয়তা, ভ্রমণ, সম্পর্ক, জীবনযাপন সবকিছুই একটি বাছাই করা, পরিশীলিত, সাজানো জানালার মতো সামনে আসে। ব্যবহারকারী তখন নিজের বাস্তব, অসম্পূর্ণ, অনুজ্জ্বল জীবনের সঙ্গে অন্যের প্রদর্শিত জীবনের তুলনা করতে শুরু করে।

এর ফলে জন্ম নেয় হীনম্মন্যতা, অস্থিরতা, অদৃশ্য প্রতিযোগিতা এবং কখনো কখনো গভীর শূন্যতাবোধ। দ্রুত বিনোদনের পরও মন তৃপ্ত হয় না; বরং আরও কিছু চায়। মানুষ ক্লান্ত হয়, তবু ফোন নামাতে পারে না। ঘুমের আগে স্ক্রল করে, ঘুম থেকে উঠেই স্ক্রল করে, আর দিনশেষে অনুভব করে সারাদিন কেটে গেল, কিন্তু ভেতরে যেন কিছুই পূর্ণ হলো না।

এটি এক ধরনের মানসিক বৈপরীত্য: আমরা উত্তেজিত, কিন্তু শান্ত নই; সংযুক্ত, কিন্তু স্থির নই; ব্যস্ত, কিন্তু পরিপূর্ণ নই। ডোপামিনের ক্ষণস্থায়ী ঝলক আমাদের চঞ্চল রাখে, কিন্তু গভীর তৃপ্তি দেয় না। তাই আমরা আবার ফিরে যাই একই চক্রে- আরও একটি ভিডিও, আরও একটি নোটিফিকেশন, আরও একটি ক্ষুদ্র পুরস্কার।

মস্তিষ্ক কি বদলে যাচ্ছে? হ্যাঁ, কিন্তু আশা এখনো আছে

মানুষের মস্তিষ্ক স্থির নয়; এটি পরিবর্তনশীল। অভ্যাস, অভিজ্ঞতা এবং পরিবেশের প্রভাবে মস্তিষ্ক নতুন স্নায়ুপথ তৈরি করে, পুরোনো পথকে শক্তিশালী বা দুর্বল করে। একেই বলা হয় নিউরোপ্লাস্টিসিটি। অর্থাৎ আমরা যেমন প্রযুক্তির প্রভাবে দ্রুত উত্তেজনায় অভ্যস্ত হতে পারি, তেমনি সচেতন অনুশীলনে আবার গভীর মনোযোগও ফিরিয়ে আনতে পারি।

সুতরাং বিপদটি বাস্তব, কিন্তু চূড়ান্ত নয়। আমাদের মস্তিষ্ক ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে, আবার পুনর্গঠিতও হতে পারে। প্রশ্ন হলো, আমরা কি তা বুঝতে প্রস্তুত? আমরা কি স্বীকার করতে পারি যে প্রযুক্তি শুধু আমাদের সুবিধার জন্য নির্মিত নয়, বরং আমাদের মনোযোগকে ধরে রাখার জন্যও নির্মিত? এই স্বীকারোক্তিই পরিবর্তনের প্রথম ধাপ।

পুনরুদ্ধারের পথ: প্রযুক্তির দাস নয়, ব্যবহারকারী হওয়া

সমাধান প্রযুক্তি বর্জন নয়; সমাধান প্রযুক্তির সঙ্গে সম্পর্ক পুনর্নির্মাণ। আমাদের দরকার এমন এক ডিজিটাল নৈতিকতা, যেখানে মানুষ তার মনোযোগকে সম্মান করবে। কারণ মনোযোগ শুধু কাজের উপকরণ নয়; এটি চিন্তার ভিত্তি, সম্পর্কের গভীরতা এবং আত্মসত্তার কেন্দ্র।

প্রথমে প্রয়োজন ইচ্ছাকৃত ব্যবধান। সব নোটিফিকেশন জরুরি নয়; সব মেসেজ তাৎক্ষণিক নয়; সব ভিডিও দেখতেই হবে এমন নয়। ফোন দূরে রেখে পড়া, নির্দিষ্ট সময়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ব্যবহার, একসঙ্গে একটিমাত্র কাজ করা এসব ছোট পদক্ষেপের মনস্তাত্ত্বিক মূল্য সত্যিই অনেক।

দ্বিতীয়ত, দীর্ঘ মনোযোগের অনুশীলন ফিরিয়ে আনা জরুরি। বই পড়া, কাগজে লিখে ভাবা, দীর্ঘ আলোচনা শোনা, বাধাহীনভাবে এক ঘণ্টা কাজ করা এসব অভ্যাস মস্তিষ্ককে আবার গভীরতার দিকে ফিরিয়ে আনে। শুরুতে বিরক্তি আসে, অস্থিরতা লাগে; কারণ মন দ্রুত উত্তেজনা চায়। কিন্তু সেই অস্থিরতা পেরিয়েই ধৈর্যের নতুন শক্তি জন্মায়।

তৃতীয়ত, একঘেয়েমিকে আবার মর্যাদা দিতে হবে। সব শূন্য মুহূর্ত পূরণ করতে হবে না। কিছু সময় ইচ্ছাকৃতভাবে ফাঁকা রাখা দরকার। জানালার বাইরে তাকিয়ে থাকা, হাঁটতে হাঁটতে চুপ করে ভাবা, কোনো কাজ ছাড়া কিছুক্ষণ বসে থাকা, এসব "অপ্রোডাক্টিভ" নয়; বরং মানসিক পুনরুদ্ধারের অংশ। এখানেই চিন্তা জমে, অনুভূতি পরিষ্কার হয়, সৃজনশীলতা অঙ্কুরিত হয়।

সবচেয়ে বড় কথা, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ঢোকার আগে একটি প্রশ্ন করা দরকার: আমি এখানে কী খুঁজতে এসেছি? তথ্য, যোগাযোগ, নাকি নিছক পালিয়ে থাকা? এই একটি প্রশ্নই অনেক অচেতন স্ক্রল থামিয়ে দিতে পারে।

উপসংহার: মনোযোগ রক্ষা মানে মানবিকতা রক্ষা

আমাদের সময়ের সবচেয়ে বড় সংকট হয়তো তথ্যের অভাব নয়, মনোযোগের অভাব। আমরা যতটা না অজ্ঞ, তার চেয়ে বেশি বিভ্রান্ত; যতটা না নীরব, তার চেয়ে বেশি শব্দ-আবিষ্ট। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম আমাদের নতুন সুযোগ দিয়েছে,

, নতুন কণ্ঠ দিয়েছে, নতুন সংযোগ দিয়েছে, কিন্তু একই সঙ্গে আমাদের মনকে করেছে ভঙ্গুর, অস্থির এবং দ্রুত উত্তেজনার ওপর নির্ভরশীল।

ডোপামিন নিজে কোনো শত্রু নয়; এটি মানবমস্তিষ্কের স্বাভাবিক প্রেরণা-ব্যবস্থার অংশ। কিন্তু যখন এই ব্যবস্থাকে বাণিজ্যিক স্বার্থে এমনভাবে ব্যবহার করা হয় যে মানুষ নিজের মনোযোগের ওপর নিয়ন্ত্রণ হারাতে থাকে, তখন সেটি শুধু প্রযুক্তিগত সমস্যা থাকে না; তা নৈতিক, সাংস্কৃতিক এবং মানবিক সমস্যায় রূপ নেয়।

মনোযোগ হারানো মানে শুধু পড়াশোনায় পিছিয়ে পড়া নয়। এর মানে গভীরভাবে শুনতে না পারা, ধৈর্য ধরে ভালোবাসতে না পারা, দীর্ঘ সময় ভেবে সত্যে পৌঁছাতে না পারা। অর্থাৎ মনোযোগের সংকট শেষ পর্যন্ত মানুষ হওয়ার ক্ষমতারও সংকট।

তাই আজকের সবচেয়ে জরুরি প্রশ্ন সম্ভবত এটি: আমরা কি আমাদের মনকে বাজারের হাতে ছেড়ে দেব, নাকি তাকে আবার নিজের ঘরে ফিরিয়ে আনব? ভবিষ্যৎ হয়তো তাদেরই, যারা দ্রুততার পৃথিবীতে থেকেও গভীরতার শক্তি রক্ষা করতে পারবে। কারণ শেষ পর্যন্ত, যে মানুষ নিজের মনোযোগকে বাঁচাতে পারে, সে-ই নিজের চিন্তা, নিজের স্বাধীনতা এবং নিজের মানবিকতাকেও বাঁচাতে পারে।

মোঃ জারিফুল ইসলাম জীম
কৃষি অর্থনীতি অনুষদ
ব্যাচ: ২৪
শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়

স্মৃতির বীজ

(সায়েন্স ফিকশন)

২১৪৮ সাল।
ঢাকা বায়োটেক ল্যাব, সেক্টর ৭।

রাত ২টা।

ল্যাবের ভেতরে নীলাভ আলো। মেশিনের ক্ষীণ শব্দ।
রাফি হাসান মাইক্রোস্কোপের সামনে ঝুঁকে আছে।
চোখ লাল, নিঃশ্বাস ভারী।

তার সামনে ভাসছে এক অদ্ভুত কোষ—
স্পিরুলিনার মতো সর্পিল, কিন্তু পুরোপুরি ভিন্ন।

এটা কোনো সাধারণ জীব নয়।
এটা তার মায়ের মস্তিষ্কের শেষ নিউরন।

"আর একটু..." সে ফিসফিস করে।

দরজার পাশে দাঁড়িয়ে মিথিলা বলে,
"রাফি ভাই, অনেক রাত হয়েছে। বাসায় যান। এই পাগলামি বন্ধ করেন।"

রাফি তাকায় না।
"মিথিলা, মানুষ মারা গেলে কী হয় জানো?"

"আত্মা চলে যায়।"

রাফি ধীরে ঘুরে দাঁড়ায়। তার চোখে অদ্ভুত এক দীপ্তি।
"না। স্মৃতি থেকে যায়। নিউরনের ভেতরে—synaptic pattern হিসেবে।
কিন্তু শরীর পচে গেলে সেই pattern নষ্ট হয়ে যায়।
আমি সেটা সংরক্ষণ করতে চাই।"

মিথিলা চুপ হয়ে যায়।

ছয় মাস আগে হঠাৎ করেই মারা গিয়েছিলেন রাফির মা।
শেষবার ফোনে রাফি বলেছিল—
"মা, কাল আসবো।"

কিন্তু সেই "কাল" আর আসেনি।

সেই অপরাধবোধই তাকে ঠেলে দিয়েছে এই অসম্ভব গবেষণায়।

তার ধারণা—
মানুষের স্মৃতি আসলে একধরনের বায়ো-ইলেকট্রিক সিগন্যাল,
যা নিউরনের মাঝে ঘুরে বেড়ায় নির্দিষ্ট প্যাটার্নে।

মৃত্যুর পরেও কিছু সময় সেই সিগন্যাল থাকে।
রাফি সেই সিগন্যালকে ধরে
একটি স্ফটিক কাঠামোয় (memory crystal) রূপ দিতে পেরেছে।

এবং—
যদি কেউ সেই ক্রিস্টাল গ্রহণ করে,
তবে সে অনুভব করতে পারবে মৃত মানুষের শেষ স্মৃতি।

তিন মাস পর।

"রাফি ভাই! হয়ে গেছে!"
মিথিলা দৌড়ে ঢোকে।

"ইঁদুরের উপর কাজ করেছে। ৮৭% accuracy!
ওটা মৃত ইঁদুরের শেষ অভিজ্ঞতা অনুভব করেছে!"

রাফির হাত কাঁপতে থাকে।

সে ধীরে ড্রয়ার খুলে।
ভেতরে রাখা ছোট্ট নীল ক্রিস্টাল—
তার মায়ের নিউরন থেকে তৈরি।

"রাফি ভাই, না—"

কথা শেষ হওয়ার আগেই
রাফি সেটি মুখে দেয়।

অন্ধকার।

তারপর—আলো।

সে দেখতে পায় একটি ছোট রান্নাঘর।
তার মায়ের হাত। বয়সের ভাঁজ পড়া, তবুও শক্ত।

ভাতের গন্ধ।
চুলার পাশে দাঁড়িয়ে মা রান্না করছেন।

রাফি বুঝতে পারে—
সে এখন নিজের চোখে নয়,
মায়ের চোখ দিয়ে দেখছে।

দেয়ালের ক্যালেন্ডারে তাকান মা।
সেই দিন—যেদিন তিনি মারা গিয়েছিলেন।

তিনি ফোন হাতে নেন।
রাফিকে কল করবেন।

কিন্তু করেন না।

বরং টেবিলে বসে একটি চিঠি লিখতে শুরু করেন।

"রাফি, তুই যদি কোনোদিন এটা পাস—
নিজেকে দোষ দিস না বাবা।
আমি জানতাম তুই ব্যস্ত ছিলি।
তোর ভালো থাকাই আমার শান্তি।"

রাফির বুক কেঁপে ওঠে।

"কিন্তু একটা কথা বলার ছিল... একটা গোপন কথা।"

"আমাদের গ্রামের বাড়ির পুরনো দেয়ালের পেছনে
একটা বাক্স আছে।
ওটা তোর দাদার।"

"খুলিস... পৃথিবী বদলে যাবে।"

হঠাৎ সব শেষ।

রাফি চোখ খুলে দেখে—
সে ল্যাবের মেঝেতে পড়ে আছে।

মিথিলা কাঁপা হাতে পানি দিচ্ছে।
"কী হয়েছিল?"

রাফি উঠে বসে।
চোখে জল, ঠোঁটে হাসি।

"আমাকে গ্রামের বাড়ি যেতে হবে।"

ময়মনসিংহ।

পুরনো দেয়াল ভাঙতে তিন ঘণ্টা লাগে।

অবশেষে বের হয় একটি মরচে ধরা বাক্স।

রাফি সেটি খুলে।

ভেতরে—
একটি ডায়েরি।
আর কিছু অদ্ভুত নীল বীজ।

সর্পিল আকৃতি।
ঠিক সেই কোষের মতো।

ডায়েরির প্রথম পাতায় লেখা—

"১৯৭২ সাল।
এই বীজ আমি মহাকাশ থেকে এনেছি।
এটা সাধারণ বীজ নয়।"

"এটা মানুষের যেকোনো রোগ সারাতে পারে।
কিন্তু সরকার চায় না মানুষ এটা জানুক।
তাই লুকিয়ে রেখেছি।"

রাফি বীজগুলো হাতে নিলো।

সে বুঝতে পারলো—
স্মৃতি শুধু অতীত নয়,
ভবিষ্যৎ গড়ার শক্তিও বহন করে।

সে একটি বীজ মাটিতে পুঁতে দিলো।

"যদি সত্যিই এটা জীবন বাঁচাতে পারে...
তাহলে এটা শুধু আমার না—সবাইয়ের।"

কয়েকদিন পর—
ছোট্ট একটি গাছ গজালো।
অদ্ভুত নীল আলো ছড়ায়।

গ্রামের এক অসুস্থ মানুষকে সেই গাছের পাতা খাওয়ানো হলো।

ধীরে ধীরে—
সে সুস্থ হয়ে উঠলো।

রাফির চোখ ভিজে গেলো।

সে আকাশের দিকে তাকিয়ে বললো—
“মা… আমি বুঝেছি।
বিজ্ঞান মানে শুধু আবিষ্কার না—
মানুষের জন্য ব্যবহার করা।”

তার হাতে আর কোনো ক্রিস্টাল নেই।

কিন্তু তার ভেতরে—
মায়ের স্মৃতি বেঁচে আছে।
আর সেই স্মৃতি থেকেই জন্ম নিচ্ছে নতুন জীবন।

নাফিসা ইসলাম তাশিন
কৃষি অনুষদ
ব্যাচ: ২৫
শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়

কবিতা

বিজ্ঞানের আলো

- মোঃ রাফিউল ইসলাম

অন্ধকার ভেদ করে আলো যে আনে,
বিজ্ঞান তার নাম, জ্ঞানেরই টানে।
সূর্যের কিরণ, নক্ষত্রের গান,
সব কিছু বুঝায় বিজ্ঞানের মান।

পরমাণুর ভেতর লুকানো রহস্য,
গভীর সমুদ্রে জ্ঞানেরই অস্তিত্ব।
মহাকাশ জুড়ে ঘুরে বেড়ায় প্রশ্ন,
উত্তর খুঁজে চলে বিজ্ঞান অনন্ত।

বিদ্যুতের ঝলক, মেশিনের গতি,
মানুষের জীবন করেছে সহজ-স্মৃতি।
রোগের বিরুদ্ধে লড়ে প্রতিদিন,
ওষুধের মাঝে লুকিয়ে আছে দিন।

চাঁদের বুকে পা, মঙ্গল গ্রহে স্বপ্ন,
বিজ্ঞানের পথে এগোয় মানবজন্ম।
অজানাকে জানার এ এক অভিযাত্রা,
বিজ্ঞানই শেখায় জয়েরই মন্ত্র।

তাই জ্ঞানকে ভালোবাসো, প্রশ্ন করো বারবার,
বিজ্ঞানই দেখাবে নতুন পৃথিবীর দ্বার।

জীবনের গোপন সুর

- মোঃ রাফিউল ইসলাম

কোষের ভেতর গড়ে ওঠে জীবনেরই ঘর,
অণু-পরমাণুর খেলায় শুরু পথের পর।
DNA-র বুকে লেখা হাজারো ইতিহাস,
বংশের স্রোতে বয়ে চলে জীবনেরই আভাস।

রক্তধারায় ছুটে চলে অক্সিজেনের গান,
হৃদয়ের স্পন্দনে জাগে বেঁচে থাকার টান।
সবুজ পাতার কোলে সূর্যের হাসি,
খাদ্য বানায় গাছ—প্রকৃতিরই ভাষা ভাসি।

বিবর্তনের পথে বদলায় রূপ,
সময় শেখায় জীবন কত অদ্ভুত রূপ।
ক্ষুদ্র জীবাণু থেকে বিশাল মানব,
সবাই মিলে গড়ে এই পৃথিবীর স্বভাব।

জীববিজ্ঞান শেখায়—জীবন কত গভীর,
প্রতিটি প্রাণে লুকায় রহস্য অগণিত ধীর।
তাই জানার তৃষ্ণায় এগিয়ে চলি আমরা,
জীবনের খোঁজে—এই তো বিজ্ঞান ধারা।

ফিরে দেখা

আঞ্চলিক জীববিজ্ঞান উৎসব ২০২৫ (ঢাকা উত্তর)

আঞ্চলিক

জাতীয় জীববিজ্ঞান উৎসব ২০২৫, বায়োক্যাম্প

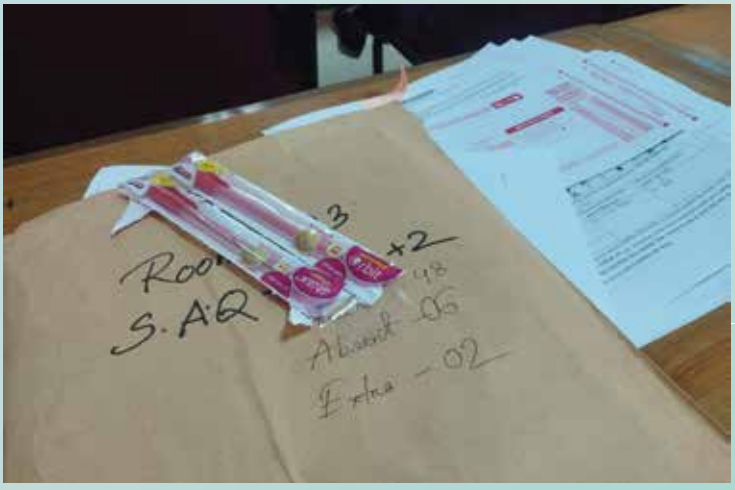

বিজ্ঞান উৎসবে অ্যাকাডেমিক টিম

প্রচারণা ও বার্ষিক সাধারণ সভা

আলোকচিত্র

কিমিয়া নাহার খুশবু (ব্যাচ- ২২)

কিমিয়া নাহার খুশবু (ব্যাচ- ২২)

তানজিয়া আমরিন (ব্যাচ- ২৩)

জান্নাতুল ফেরদৌস নীলা (ব্যাচ- ২৪)

রিফা সানজিদা (ব্যাচ- ২২)

রিফা সানজিদা (ব্যাচ- ২২)

মিথিলা সুরভী (ব্যাচ- ২৪)

জান্নাতুল ফেরদৌস নীলা (ব্যাচ- ২৪)

জান্নাতুল ফেরদৌস নীলা (ব্যাচ- ২৪)

জাহিন সুবহা (ব্যাচ- ২২)

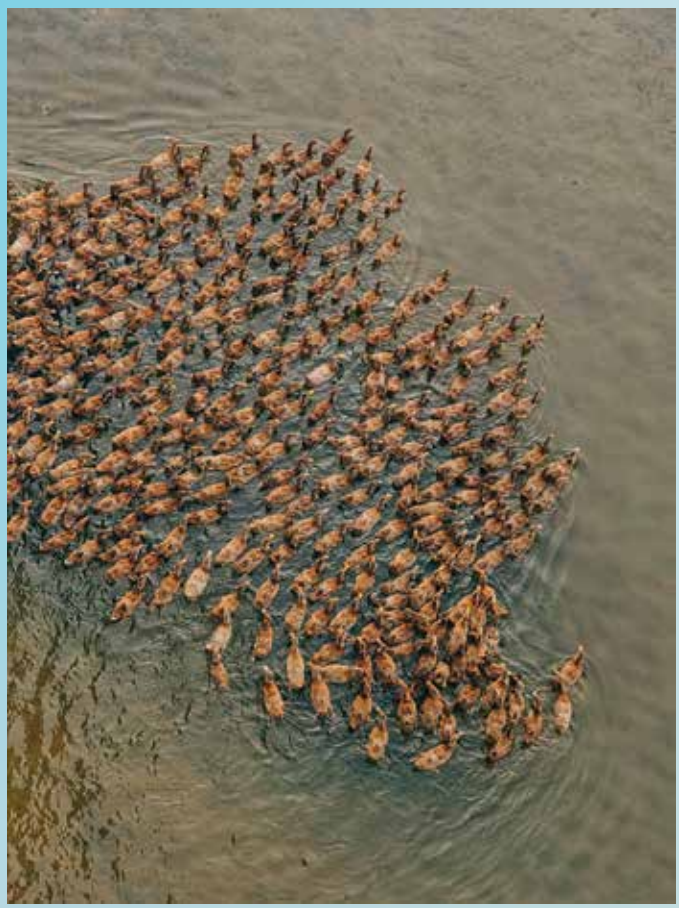

রিফা সানজিদা (ব্যাচ- ২২)

রিফা সানজিদা (ব্যাচ- ২২)

ইশরাত জাহান এশা (ব্যাচ- ২৩)

GBAL

গ্রীন বাংলা এগ্রোভেট লিমিটেড

বিগত বছরের সাফল্যগাঁথা

সাল	অর্জন
২০১৬	২ টি মেধা পুরস্কার
২০১৭	২ টি মেধা পুরস্কার
২০১৮	১টি ব্রোঞ্জ পদক
২০১৯	৩টি ব্রোঞ্জ পদক
২০২০	২টি ব্রোঞ্জ পদক
২০২১	২টি ব্রোঞ্জ পদক
২০২২	৪টি ব্রোঞ্জ পদক
২০২৩	২টি ব্রোঞ্জ পদক ও মেধা পুরস্কার
২০২৪	ব্রোঞ্জ পদক ও ৩টি মেধা পুরস্কার
২০২৫	৩টি ব্রোঞ্জ পদক

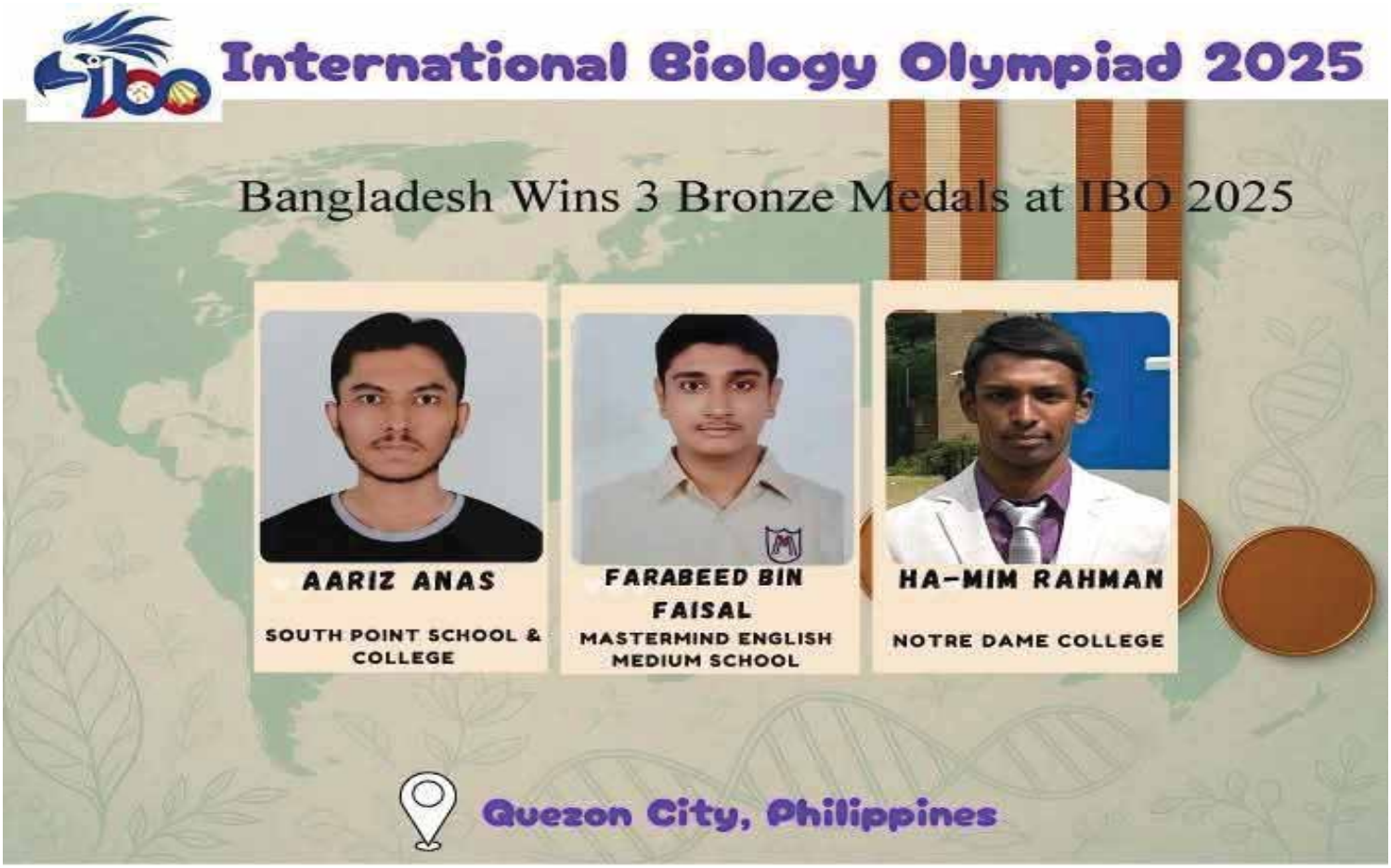

DOCTORS' HOPE PRIVATE LTD.

Building Trust. Delivering Excellence.

13+ Ongoing Projects. 250+ Clients. Since 2018

"Doctors' Hope Private Limited is a trusted real estate and multi-sector company delivering modern, high-quality solutions since 2018."

VISION OF DHPL

Hospital & Diagnostic
Real Estate
Pharmaceuticals
Resort & Agro
Elevators & Engineering
Contact Information

Address:

House: 274, Road: 04, Avenue: 01
Mirpur DOHS, Mirpur-12, Dhaka-1216

Phone:

01894443080, 01842232442

Email:

dhplbd@gmail.com

Opened an option to join only for Bangladesh Biology Olympiad Respected Guests

Dr. Pran Ashraf

Vice President,
Bangladesh Biology Olympiad Dhaka North
01623812474

Scan to Visit Our wev Page

Our Facebook Page

খাদ্য পুষ্টিতে উন্নতি
আনবে দেশের সমৃদ্ধি

ভার্মি কম্পোস্ট উৎপাদন

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পুষ্টি বাগান

বসতবাড়ির আশপাশ
করো সবাই সবজি চাষ

পারিবারিক পুষ্টি বাগান

পুষ্টি বুঝে খাদ্য খেলে
সুস্থ সুন্দর স্বাস্থ্য মেলে

প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

কচু জাতীয় সবজি প্রদর্শনী

হলুদ চাষ প্রদর্শনী

প্রকল্পের কার্যক্রমঃ

১) পারিবারিক পুষ্টি বাগান স্থাপনসহ বিভিন্ন প্রদর্শনী
২) কৃষক/কৃষাণী, এসএএও প্রশিক্ষণ ও উঠান বৈঠক
৩) কমিউনিটি বেইজড ভার্মি কম্পোস্ট উৎপাদন পিট স্থাপন
৪) জিরো এনার্জি কুল চেম্বার স্থাপন (শাক-সবজি সংরক্ষণের জন্য)
৫) কৃষক গ্রুপে ক্ষুদ্র যন্ত্রপাতি বিতরণ
৬) কৃষক-কৃষাণী/এসএএও উদ্বুদ্ধকরণ ভ্রমণ।

অনাবাদি পতিত জমি ও বসতবাড়ির আঙ্গিনায়
পারিবারিক পুষ্টি বাগান স্থাপন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)
কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, কৃষি মন্ত্রণালয়

কৃষিবান্ধব বর্তমান সরকার খাদ্য নিরাপত্তা অর্জনের পাশাপাশি উন্নত মানসম্পন্ন নিরাপদ আম উৎপাদন ও রফতানির মাধ্যমে কৃষকের আর্থসামাজিক অবস্থা উন্নয়নে বদ্ধপরিকর।

প্রকল্পের কার্যক্রমঃ

১। **আম উৎপাদন প্রদর্শনী স্থাপন**

২। **প্রশিক্ষণ**

৩। আমের পেস্টরিস্ক এ্যানালাইসিস (পিআরএ) ও উত্তম কৃষি চর্চা তৈরী

৪। জিআইএস প্রযুক্তি ব্যবহার করে প্রদর্শনী এবং কৃষি প্রযুক্তির তথ্য আদান-প্রদান ও সংরক্ষণ

৫। ম্যাংগোগ্রেডিং, ক্লিনিং ও কুলিং শেড নির্মান

৬। ক্ষুদ্র কৃষি যুন্ত্রপাতি সরবরাহ (ম্যাংগো প্লাকার, হাইড্রোলিক ম্যাংগো হার্ভেস্টার, গার্ডেন টিলার, ফুট পাম্প, এলএলপি, ডি-লেট্যাক্সিং ট্রে, ফোম নেট, ভার্জিন ফ্রুট বক্স ও ফিতাপাইপ সেট)।

৭। সেমিনার (রফতানিকারক, উৎপাদনকারী ও স্টেকহোল্ডার)

৮। আম মেলা

৯। **উদ্বুদ্ধকরণ ভ্রমণ**

রফতানিযোগ্য আম উৎপাদন (১ম সংশোধিত) প্রকল্প

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর
খামারবাড়ি, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫।

ফসল

ধানের আগাছা দমনে ফসল এগ্রোর আধুনিক সমাধান

প্রোটিলাক্লোর + পাইরাজোসালফিউরন ইথাইল

২,৪-ডি-এমাইন

পাইরাজোসালফিউরন ইথাইল

ফসল এগ্রো ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ

হাউজ# ৯(৬ষ্ঠ তলা), রোড-১, ব্লক-বি, সেকশন-১০, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬

আইসিএস হাইব্রিড বীজে,
কৃষকের ঘরে শান্তি আনে!!!

ICS
স্বপ্ন বুনি, ভবিষ্যৎ গড়ি

ICS
ইন্টিগ্রেটেড ক্রপ সলিউশন বাংলাদেশ

কর্পোরেট অফিস: নন্দন আইকন (৫ম ও ৬ষ্ঠ তলা), হাউজ: ৪৫, রোড: ১৫, সেক্টর: ৩, রবীন্দ্রসরণী, উত্তরা বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা: ১২৩০।

জীবপ্রযুক্তির মাধ্যমে কৃষিবীজ উন্নয়ন ও বর্ধিতকরণ প্রকল্পের সাফল্য

টিস্যুকালচার প্রযুক্তির মাধ্যমে আলু ও উদ্যান জাতীয় ফসলের প্লান্টলেট উৎপাদন ও বৈদেশিক মুদ্রার সাশ্রয়

টিস্যুকালচার প্রযুক্তির মাধ্যমে আলু ও উদ্যান জাতীয় ফসলের প্লান্টলেট উৎপাদন কার্যক্রম চলছে

জীবপ্রযুক্তির মাধ্যমে কৃষিবীজ উন্নয়ন ও বর্ধিতকরণ (১ম সংশোধিত) প্রকল্প

বিএডিসি, ঢাকা

pdbitechnology@gmail.com, www.badc.gov.bd

TARAPS

THE WORLD BANK

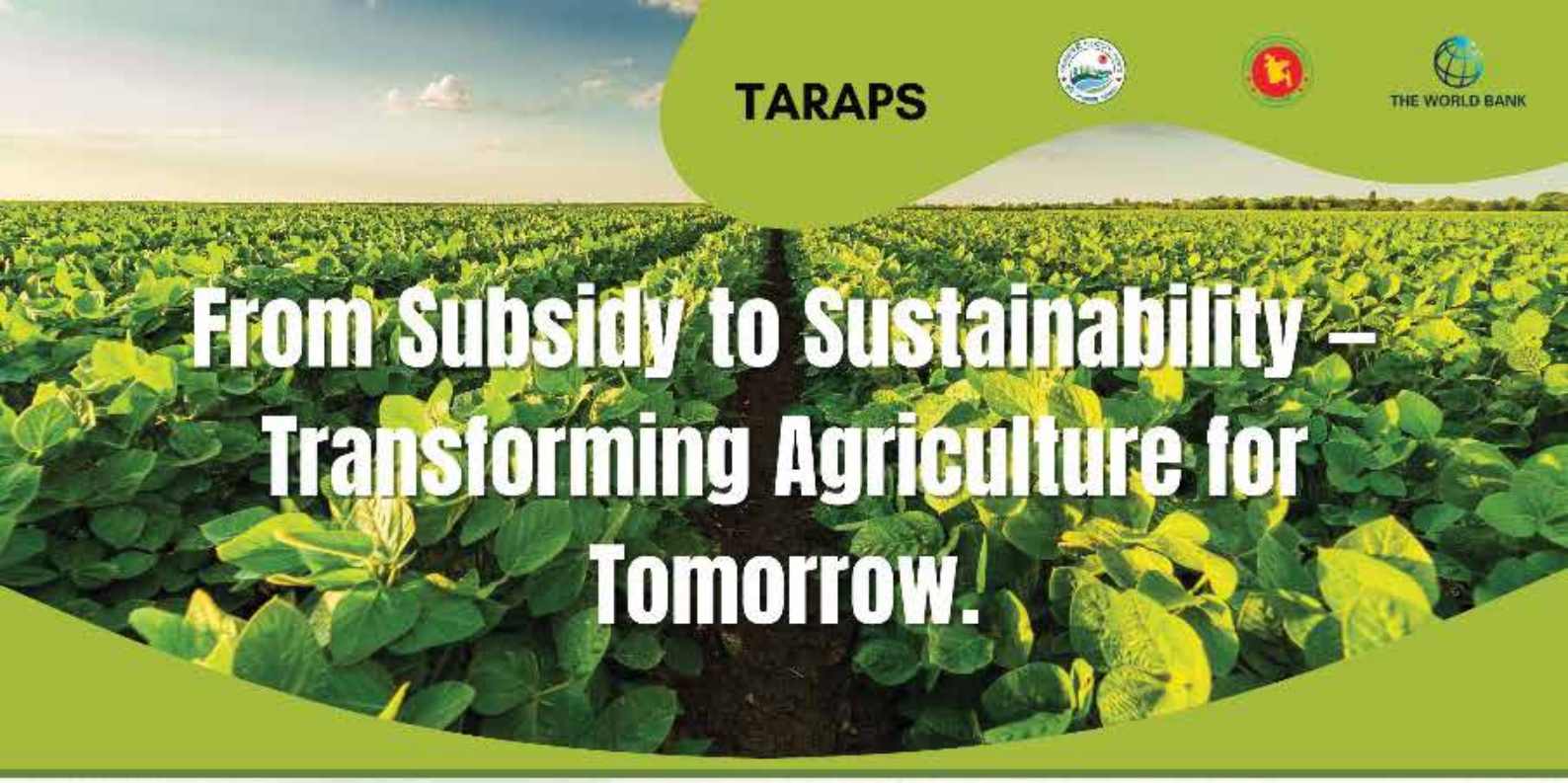

From Subsidy to Sustainability – Transforming Agriculture for Tomorrow.

About Us

TARAPS represents a partnership between the Government of Bangladesh and the World Bank's Food Systems 2030 Program to modernize agricultural support and promote a sustainable food system transformation. It will create a foundation for climate-smart agriculture, strengthen public institutions, and ensure that both donor and government resources reach the people who matter most—Bangladesh's farmers.

TARAPS for Farmers

TARAPS will help farmers move toward climate-smart, profitable, and sustainable farming. Through improved access to e-voucher systems, modern input management, and evidence-based training, farmers will enjoy better yields, lower production costs, and more resilient livelihoods. The project will promote smarter use of fertilizer and inputs—helping farmers protect the soil, conserve resources, and build long-term productivity.

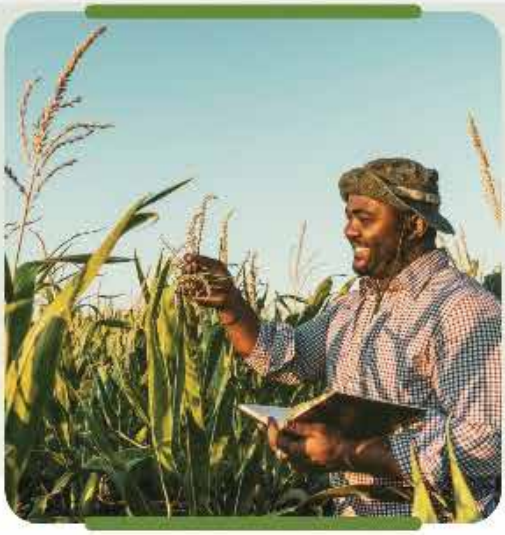

TARAPS for Government

The project will strengthen the Ministry of Agriculture's capacity to monitor spending, design effective subsidy policies, and align programs with national priorities. By introducing digital monitoring tools and analytical systems, TARAPS will ensure transparency, efficiency, and value for money—making every Taka count. This will help the Government gradually repurpose input subsidies toward programs that deliver greater benefits for farmers and the environment.